ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা ॥ সংখ্যা ১০৪ ও ১০৫ (যুক্ত), সেপ্টেম্বর ২০২৪
ISSN : 2411-9059, e-ISSN: 3006-3078 DOI : http://dx.doi.org/10.62296/DVP/10405/007

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র ছোটোগল্প : পুরুষ অবয়ব

নিলুফা আক্তার*

Abstract : Waliullah is a renowned writer who focuses on the human psyche, examining both external life and internal life. He acknowledges the influence of sociologically imposed traditional mind formations on the lives of men and women, maintaining a neutral perspective. Waliullah's short stories explore the social dress of male characters, creating colourful, sincere, hearty, and sometimes brutal, unforgiving, and helpless characters. Through multifaceted research, he aim to uncover the psychological profile of individual men, allowing readers to understand and enjoy their psycho-extraterrestrial world. His work is a testament to the complexity of human relationships and the interconnectedness of external and internal life.

মুখ্যশব্দ: পুরুষতন্ত্র, নারীবাদ, শ্রেণিবৈষম্য, মাতৃত্ববোধ, পিতৃত্ববোধ ইত্যাদি।

লেখকের অন্তর্গত সত্তার লৈঙ্গিক-চেতনা কোনো না কোনোভাবে তাঁর সৃষ্টিকর্মে ছাপ রেখে যায়। সেই এপিটাফে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর সৃষ্টিশীল ও মননশীল দৃষ্টিভঙ্গির প্রকৃত স্বরূপ। যখন একজন লেখক লিঙ্গান্তরের ঊর্ধ্বে নৈর্ব্যক্তিক হয়ে ওঠেন, তখন সেই লেখকের সৃষ্টি গুণগত মানে স্বতন্ত্র মর্যাদায় আসীন হয়। কারণ সর্বার্থে নিরপেক্ষ ও নির্মোহ হয়ে সৃষ্টিকে নির্মাণ ও প্রকাশ করতে পারা দুরূহ সাধনা। সেই কঠিন কর্মটি সম্পাদন করেছেন বাংলাদেশ তথা বাংলা উপন্যাসে নবধারার বলিষ্ঠভাব নির্ণায়ক কথাশিল্পী সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ (১৯২২-১৯৭১)। আর তাই প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক, কূটনৈতিক সব পরিচয়কে ছাপিয়ে বিকশিত হয়ে ওঠে তাঁর কথাশিল্পী পরিচয়। উপন্যাসের মতো গল্প সৃজন ও নির্মাণেও তাঁর স্বকীয়তার ছাপ সুস্পষ্ট। সনাতন গল্প

---

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট

কাঠামোকে অক্ষত রেখে তিনি কাহিনি উপস্থাপনের চমৎকারিত্ব ও বিষয়বস্তু নির্বাচনে অধিক মনোযোগী হয়েছেন। সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের যাপিত জীবন ও ভাষাবৈচিত্র্য। পূর্ব-পুরুষ আরব-জাতির রক্ত ও ঐতিহ্য তাঁর ধমনীতে প্রবহমান থাকলেও আজন্ম-আমৃত্যু তিনি ধারণ-লালন-পালন করেছেন বাঙালির জাতিত্ববোধ। চলনে-বলনে-কথনে আভিজাত্য ছিলো সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র স্বভাবজাত কিন্তু সব শ্রেণিছাপ অতিক্রম করে তিনি ছিলেন আপাদমস্তক দেশজ মানুষ। বাংলাদেশের মাটি আর মানুষের রূপ রস গন্ধ স্বাদ সবই তাঁর চেতনাকে স্পর্শ করে, তাঁর গল্প উপন্যাসের দেহাত্মায় দৃঢ়ভাবে মিশে আছে।[১]

একজন লেখক হিসেবে তিনি মানব অস্তিত্বের দুটো অবয়ব নারী ও পুরুষ উভয়ের মনোদৈহিক গড়ন নির্মাণে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সত্যিকারের নির্মাণ শিল্পী ছিলেন। একজন শিল্পী যেমন সৃষ্টির পর সেই শিল্পকে নির্মাণ-বিনির্মাণের মাধ্যমে সর্বোচ্চ তৃপ্তির স্থানে পৌঁছাতে নিমগ্ন থাকেন, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ও ঠিক তেমনি ছোটোগল্প সৃজনের পর গল্পের কাহিনি,অবকাঠামো, চরিত্র, ভাষা, সংলাপ ইত্যাদির অবিরাম ব্যবচ্ছেদের মাধ্যমে নব-নির্মাণে মগ্ন ছিলেন চূড়ান্ত তৃপ্তির সন্ধানে। ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর ছোটোগল্পের স্রষ্টা ও নির্মাতা দুই ভূমিকাতেই দুর্দান্তভাবে সার্থক।

স্রষ্টা লেখক যখন সৃষ্টি করেন তখন লিঙ্গভেদে আক্রান্ত না হলে অর্থাৎ পুরুষতান্ত্রিক কিংবা নারীতান্ত্রিক মানসিকতামুক্ত থাকলে তাঁর ভাবনা স্পষ্ট ও নিরপেক্ষ হয়। অন্যভাবে বলা যায়, লেখক তাঁর সৃষ্ট চরিত্রকে নিজের ভেতর আত্মস্থ করে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করলে, তাঁর গাঁথুনি এবং গ্রহণযোগ্যতা দৃঢ়তর হয়। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে এই উভয় বৈশিষ্ট্য দৃষ্টান্ত দেয়ার মতো করে দৃশ্যমান। বিশেষ করে গল্প-উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলোর এতো বিচিত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে সৃষ্টি ও নির্মিতি, এতো নিখাদ ও জীবন্ত যে, ভাবতে অবাক লাগে একজন লেখকের পুরুষসত্তার বহুমুখী ভাবনা থেকে উৎসারিত নারী চরিত্রের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর বোধগুলো কী বিস্ময়করভাবে পাঠকের সামনে দৃশ্যমান চেহারা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এই অসাধ্য কাজটি সাধন সম্ভব হয়েছে লেখকের গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও সুতীব্র মগ্ন চৈতন্যের সুষম মেলবন্ধনে। বাংলা সাহিত্যে নারীর গোপনবোধ মুক্তকরণে সিদ্ধহস্ত কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের যোগ্য উত্তরসূরি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্। ঠিক উলটো দিক পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, পুরুষ ওয়ালীউল্লাহ্‌র মানসজগতের অন্তস্তলে বসতকারী লেখক ওয়ালীউল্লাহ্ পুরুষ চরিত্র সৃষ্টি ও নির্মাণেও বিস্ময়করভাবে জীবন্ত ও পক্ষপাতহীন।

বাংলা সাহিত্যের ক্ষণজন্মা বিরলপ্রভা প্রতিভা ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর পঞ্চাশ বছরের (১৯২২-১৯৭১) জীবদ্দশায় প্রথম গল্প লেখেন সতেরো বছর বয়সে। সেই হিসাবে তাঁর লেখালেখির বয়স বত্রিশ বছর। এই সময়ে তিনি বাংলাদেশের উপন্যাসের গতিপথ ও চরিত্রের সার্বিক স্বরূপ যেমন চিহ্নিত করেছেন; তেমনি বলা যায় পরিমাণে নয় বরং গুণগত মানে অসাধারণ সৃষ্টিশীল ও নিরীক্ষাধর্মী গল্প সৃষ্টি-নির্মাণের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে যুক্ত করেছেন সমৃদ্ধির পালক। তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু পরিধি সীমাবদ্ধ হলেও শিল্পকর্ম হিসেবে গল্প উপস্থাপনে তিনি দক্ষ ও স্বতন্ত্র। ওয়ালীউল্লাহ্র সমকালীন গল্পকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ও অকালপ্রয়াত, কিন্তু তাঁরও সৃষ্টির ব্যাপ্তি নেহাৎ কম নয়। আটচল্লিশ বছরের জীবনকালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায় বিশ বছর সৃষ্টির জগতে সক্রিয় ছিলেন। স্বল্পকালীন জীবনের তুলনায় তাঁর সৃষ্টির সম্ভার বিস্ময়কর। এই সমৃদ্ধির ভিড়ে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ জীবদ্দশায় তিনটি উপন্যাস, মরণোত্তর দুটি উপন্যাস, চারটি নাটক এবং *নয়নচারা* (১৯৪৫) এবং *দুইতীর ও অন্যান্য গল্প* (১৯৬৫) গল্পগ্রন্থ নিয়ে নিজের শক্ত অবস্থান নিশ্চিত করেছেন। তাছাড়া উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অপ্রকাশিত গল্প রয়েছে যা পরবর্তীকালে প্রকাশিত হয়। কারণ চল্লিশের দশকের শেষে পূর্ববঙ্গের সাহিত্যের নিজস্ব ক্ষেত্র নির্মাণের শুভ সূচনা ঘটে, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র *লালসালু* (১৯৪৮) উপন্যাসের মাধ্যমে। বলা যায়, এই উপন্যাসটি অবিভক্ত ভারতের বন্ধনছিন্ন সদ্য গঠিত পূর্বপাকিস্তান তথা ঢাকাকেন্দ্রিক সাহিত্যচর্চার নতুন গন্তব্যের পথ নির্দেশনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তিনি তাঁর তিন দশকের সৃষ্টিশীল কর্মজীবনে প্রথম দেড় দশক গল্প লেখেন।

স্রষ্টা ও নির্মাণশিল্পী সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র গল্পের শরীর উপমাময়, কাব্যিক, ভাষা ও কাহিনি আঞ্চলিকতায় বহুরূপময় ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ। ব্যক্তি-লেখক-সাংবাদিক ত্রয়ী দৃষ্টির আলোকপাতে স্বচ্ছ ও বাহুল্য বর্জিত তাঁর অভিজ্ঞতাসঞ্জাত সমাজ ও যাপিত জীবন। তাই তাঁর গল্পের সমাজ শুধু খালি চোখে দৃশ্যমান, গতানুগতিক কাহিনির বয়ান না হয়ে, নিরপেক্ষ অনুসন্ধানকারীর নিরীক্ষাধর্মী পর্যবেক্ষণও হয়ে উঠেছে। তবে তিনি সমাজের ঊর্ধ্বে গুরুত্ব দিয়েছেন ব্যক্তিক সংকটকে। কারণ তিনি খুব ভালো করেই জানতেন যে, সমাজ নিষ্প্রাণ বস্তু নয়, ব্যক্তির সামষ্টিক অব্যয়ে সমাজ গড়ে ওঠে। ব্যক্তিই মূল সমাজ। কখনো একক কখনো গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে সে সমাজকে চালিত করে। ফলে সমাজের মূলে যেতে হলে, সাঁকো হচ্ছে ব্যক্তি। এই ব্যক্তির পাঠ-ই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর গল্পের মৌল স্পৃহা। তাঁর গল্পের দেহ-প্রাণের পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করার ক্ষেত্রে মনোযোগী পাঠক হওয়ার বিকল্প নাই। ওয়ালীউল্লাহ্র গল্পের জীবনাভিজ্ঞতা সচেতন পাঠকের উপলব্ধিবোধকে শুধু উজ্জীবিত করে না, শাণিতও করে।

পূর্ববঙ্গের তৎকালীন সাহিত্যের মুসলিম লেখকগণ স্ব-অবস্থান থেকে দেশভাগের নির্মম প্রহসনের শিকার খণ্ডিত-বিখণ্ডিত আত্মার যন্ত্রণার্ত জীবনবাস্তবতা ছাড়াও, নতুন গড়ে ওঠা পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালি সমাজকেও গভীর মনোনিবেশ সহকারে অবলোকন করে গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ অর্থাৎ সাহিত্যের প্রায় সবক্ষেত্রে তাঁদের সৃষ্টির জগৎকে নতুন করে পর্যালোচনা, বিচার, বিশ্লেষণ করার প্রয়াস নেন। দেশভাগের পরবর্তী ঢাকাকেন্দ্রিক বাংলা সাহিত্যের পথরেখা নির্ণয়ে, নির্ধারণে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সৃষ্টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তাঁর গল্পের সমাজ প্রধানত মুসলিম সমাজ। উনিশ শতকের নবজাগরণের বিচিত্র আহ্বান, মানসজগৎ, যাপিত জাগতিক জীবনে পশ্চাৎপদ মুসলিম সমাজের পাকিস্তানের নাগরিকত্ব গ্রহণের সন্ধিক্ষণ এবং অবিভক্ত ভারতের মুসলিম জীবন ও চিন্তা তাঁর গল্পে বহুকৌণিক দৃষ্টি ও বহুমুখী ভাবনায় জারিত হয়ে বিশেষ গুরুত্বসহ অধিষ্ঠ।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র গল্পে ‘পুরুষ অবয়ব’ নানা পরিস্থিতিতে সনাতন এবং পরিবর্তনশীল বিচিত্র মানসিক গড়ন নিয়ে সম্পূর্ণ পক্ষপাতহীনভাবে প্রকাশিত হয়েছে। প্রাত্যহিক জীবনের গতিশীলতার সঙ্গে প্রবহমান পুরুষ চরিত্রগুলোকে লেখক আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে বহুকৌণিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে নির্মাণ করেছেন। তাঁর সাংবাদিক চোখ, সংবেদনশীল মন চেতনে-অবচেতনে নিবদ্ধ হয়েছে বিভিন্ন মানুষের নিত্য জীবনের অন্দর-বহির্মহলে, তাদের মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ওপর। যেখানে আপাতদৃষ্টিতে সমাজকে উপলক্ষ্য করে কাহিনির নির্মিতি মনে হলেও প্রধানত তাঁর মনোযোগ ছিল ব্যক্তির ওপর, তারপর পরিবার ও সমাজের ওপর।

ব্যক্তিকে কেন্দ্রে রেখে তিনি সমাজের ঘর-মন-জানালা উন্মোচন করেছেন।

“দুই তীর” গল্পের মূল পুরুষ চরিত্র আফসার উদ্দিন সমাজের উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা। অফিসে তিনি কর্তা কিন্তু ঘরে তিনি নীরব নিষ্ক্রিয় এক সদস্য শুধু। স্ত্রী হাসিনা তার সকল মানসিক টানাপোড়েনের নাটাই, আর আফসার উদ্দিন যেন সেই নাটাইয়ের ঘুড়ি। শ্বশুর আরশাদ আলীর স্ত্রী মরিয়ম বেগম অর্থাৎ হাসিনা বিবির মায়ের থেকে যেন এই নাটাই উপঢৌকন হিসাবে আফসার উদ্দিনের জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। আফসার উদ্দিনের মনোজাগতিক বিপর্যয়ের আক্ষরিক প্রকাশ ঘটেছে এভাবে—

> তার স্ত্রী হাসিনাই যেন তার সে অস্ফুট ভয় শঙ্কা এবং তার বর্তমান জীবন সম্পর্কে সচেতনতার কারণ। দুই জীবনের মধ্যে যে পুল, সে পুলের মধ্যখানে হাত বাড়িয়ে পথরুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে তার স্ত্রী। (ওয়ালীউল্লাহ্‌, ২০১৩, পৃ. ৩৬৫)

এই আশংকা, গোপন ভীতির কারণ তৎকালীন মুসলমান সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ঐতিহ্যাভিমান আবার পুরুষতান্ত্রিক[২] একধরনের আত্মপ্রবোধও বটে। তথাকথিত আভিজাত্যের কাছে শেষপর্যন্ত হার মানে পদস্থ কর্মকর্তা আফসার উদ্দিন। একাকী যুদ্ধ করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা আফসার উদ্দিন খানদানি পরিবারের কন্যা হাসিনাকে বিয়ে করে নিজেকে কুলীনের স্তরে তুলতে সর্বদা সতর্ক। কিন্তু প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করে টিকে থাকায় সচেষ্ট আফসার উদ্দিনের ভেতরের মানুষটা আভিজাত্যের নকল পোশাক পরিধান করে নিয়ত আত্মগ্লানিতে পর্যুদস্ত–

> ভৃত্যের এ-সেবায় আফসারউদ্দিন যে আনন্দবোধ করে, তা নয়। বরঞ্চ জুতা বাড়াতে গিয়ে প্রতিদিন কেমন জড়তাবোধ করে, তার পা-দুটি পাথরের মতো ভারি হয়ে ওঠে। (ওয়ালীউল্লাহ্‌, ২০১৩)

এই ভার আসলে আফসার উদ্দিনের অনুশোচনা, অপরাধবোধের মানসিক চাপ, সমাজের চাপিয়ে দেয়া শ্রেণি বৈষম্যের বোঝা। নিজেকে পরিস্থিতির কাছে নতজানু করা, ভৃত্য আবদুল্লাকে দিয়ে অসম্মানের কাজ করানো যে তাকে মানসিক পীড়া দেয় সেই যন্ত্রণার শাস্তি, যা থেকে তিনি প্রতিদিন মুক্তি চান, প্রতিদিন আরও তীব্রভাবে বন্দি হোন। এই মুক্তিহীনতার কারণ আফসার উদ্দিনের খানদানি বংশোদ্ভূত স্ত্রী হাসিনার সম-অবস্থানে আসীন হবার মরিয়া আকাঙ্ক্ষা। স্ত্রীকে আপন করে পাবার নিবিড় তৃষ্ণা-ক্ষুধা-প্রেম। তাই এই জটাজাল থেকে আফসার উদ্দিন মুক্তি পান না। অর্থ, শ্রেণি-ব্যবধান সমাজের এক স্তর অতিক্রম করে আরেক স্তরে পৌঁছানোর যে 'পুল' নির্মাণ করে দিয়েছে, বৈবাহিকসূত্রে সেই সেতুতে তিনি পা রাখার অধিকার পেলেও সেই 'সাঁকো'তে বিছানো তথাকথিত আভিজাত্যের কণ্টক অতিক্রম করে শেষপর্যন্ত স্ত্রীর হৃদপিণ্ডের উষ্ণতার স্বাদ আস্বাদনে তিনি ব্যর্থ হোন। সাংবাদিক লেখকের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি, কৌতূহলী মন দিয়ে লেখক, স্বামী আফসারউদ্দিনের অন্তর্দাহ, স্ত্রী হাসিনার অহমিকা এক নির্মম নির্লিপ্ততার মধ্য দিয়ে উনিশ শতকীয় ক্ষয়িষ্ণু মুসলমান সমাজের কৌলীন্য প্রথা নামক সংক্রামক ব্যাধি যে

সমকালে কী নির্মমভাবে ব্যক্তির মগজে, অন্দরমহলে, দাম্পত্য জীবনকে আষ্টেপৃষ্ঠে গ্রাস করেছে, লেখক সেই সর্বনাশা ক্ষয়ের ইঙ্গিত করেছেন। শাহেদ আলীর *নানীর ইন্তেকাল* গল্পে 'আশরাফ-আতরাফ' দ্বন্দ্বের বলির পাঠা নানীর একমাত্র মেয়ে ওয়ারেসের মা। যিনি সম্পর্কে গল্প-কথকের খালা। ধর্মে সমতার কথা বলেছে এই সত্য প্রমাণ করার জন্য নানী তাঁর একমাত্র মেয়েকে 'নজর তরফ'-এর ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেন। কিন্তু তাঁর কন্যা কখনোই সামাজিকভাবে অসাম্য এই বিয়ে মেনে নিতে পারেনি। কথকের উপলব্ধি–

> কিন্তু দুনিয়াটা বড়ো আজব জায়গা। খালুর বদনাম তো ঘুচলেই না, বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খালাও প্রচণ্ডরকমে সজাগ হয়ে উঠলেন নিজের খান্দানি ইজ্জত সম্বন্ধে। এজন্য খালার জীবনের দুঃখ আর বেদনার সীমা ছিলো না। (শাহেদ, ২০০১, পৃ. ৪৪)

দুটো গল্পতেই সম্ভ্রান্ত বংশের স্ত্রীদের নির্মম দ্বন্দ্বের নাগপাশে নীরব মানসিক নির্যাতনের শিকার এই তিনজন পুরুষ– আরশাদ আলী, আফসারউদ্দিন এবং খালু।[৩]

"দুইতীর" এবং "নানীর ইন্তেকাল" গল্পদুটিতে যেন ব্যক্তি ও সমাজ মুখোমুখি। স্বীয় যোগ্যতায় সুপ্রতিষ্ঠিত আফসারউদ্দিন সমাজে উচ্চপদে আসীন হলেও, অন্দরমহল তথা সমাজের গোড়ায় পরিবর্তনে ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ। একই বাস্তবতা খালুর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। 'স্ত্রী হাসিনা', 'খালা' এই দুই নারীর মিথ্যা অহংকারের দেয়াল ভাঙার চেষ্টা না করে, মৌন থেকে সেই ফানুসরূপী দেয়ালকে স্পর্শ করাই যেন দুই পুরুষের কাছে মুখ্য হয়ে ওঠে। এই আকাঙ্ক্ষা শেষপর্যন্ত শুভঙ্করের ফাঁকি হয়ে ব্যক্তি আফসারউদ্দিনের যোগ্যতার মানদণ্ডকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। আত্মপ্রবোধে মগ্ন আফসারউদ্দিন শ্বশুর আরশাদ আলীর পরাজয় অনুভব করেন অথচ এ পরাজয় তাঁর নিজেরও–

> অবশেষে আফসারউদ্দিন সুস্থির হলে এবার শান্ত পরিচ্ছন্নতার মধ্যে সে সুস্পষ্টভাবে একটি মুখ দেখতে পায়। সে মুখ হাসিনার নয়, মরিয়ম খানমেরও নয়। সে-মুখ আরশাদ আলী সাহেবের। তাঁর বয়স ক্লান্ত মুখে যেন গভীর পরাজয়ের ছায়া। (ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১৩, পৃপৃ. ৩৭৮)

আভিজাত্যের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আফসার উদ্দিন নিজেকে নির্দোষ এবং যোগ্য প্রমাণে মরিয়া, ক্লান্ত, আত্মপ্রশ্নে ক্ষত-বিক্ষত। স্বামী-স্ত্রীর মনের মধ্যখানে 'কাঁটাতারের বেড়া'—এই বিভাজন ধর্মের নয় বরং ধর্ম আরোপিত অসুখ 'কৌলীন্যবোধ' সমাজের চাপিয়ে দেওয়া শ্রেণিভেদ। পারস্পরিক শ্রদ্ধাহীন, প্রেমহীন দাম্পত্য জীবনের মাঝে ভঙ্গুরপ্রায় যোগসূত্র হয়ে আছে শুধু দুটো রক্ত মাংসের মানুষী দেহের যৌন ক্ষুধা মিটানোর, রক্ত-মাংসের অপ্রতিরোধ্য মানুষী আবেগ, বাঁধহীন উত্তেজনা। আর সেই মুহূর্তে তুচ্ছ হয়ে যায় আশরাফ-আতরাফের সকল দূরত্ব—

> শীঘ্র আফসারউদ্দিনের একটি হাত নক্ষত্রের মতো ছিটকে পড়ে, তারপর সে-হাত অধীরভাবে আরেকটি হাতের সন্ধান করে। কালো রাত্রির বন্যা থেমেছে কিন্তু মনের নির্মুক্ত হাহাকার অদম্যভাবে প্রবল হয়ে উঠেছে। এখনো সে হাসিনাকে দেখতে পায়। হাসিনার চোখে নতুন দৃষ্টি। সে চোখে আর বিদ্রুপ নাই, আফসারউদ্দিনের মনে যে ক্ষুধা, সে ক্ষুধার প্রতি আর বিদ্রুপ নাই। যে অন্ধকারে কালো রাত্রির জন্ম হয়, যেখানে তার দুর্বার বন্যার সৃষ্টি হয়, সে ক্ষুধাটির জন্ম হয় বলে কেউ তাকে বিদ্রুপ করতে পারে না। (ওয়ালীউল্লাহ্‌, ২০১৩, পৃপৃ. ৩৭২-৩৭৩)

যৌন ক্ষুধার কাছে স্বামী আফসারউদ্দিনের হীনম্মন্যতা আর স্ত্রী হাসিনার উচ্চম্মন্যতা এক হয়ে মিশে যায় রাতের অন্ধকারে অথচ দিনের আলোয় আবার স্পষ্ট হয়ে ওঠে কাঁটাতারে তীক্ষ্ণ ছেদ। নারী-পুরুষের আদিম বিবশতা বিলীন হয়ে উচ্চকিত হয়ে ওঠে সামাজিক অসহনশীলতার কণ্টকাবৃত প্রাচীর। পরাজিত দুই পুরুষ আরশাদ আলী আর আফসার উদ্দিন। আরশাদ আলী তার বিবাহিত জীবনের ব্যর্থতা খানিকটা পুষিয়ে নিতে চায়, আত্মপ্রবোধে স্বস্তি পেতে চায় দরিদ্র পরিবারের সন্তান, সুপ্রতিষ্ঠিত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা আফসারউদ্দিনের সঙ্গে একমাত্র কন্যা হাসিনার বিয়ে দিয়ে। পুরুষতন্ত্রের মন্ত্রণায় দীক্ষিত পিতা আরশাদ আলীর কঠিনতন্ত্রের সামনে মা ও কন্যার মতামত চরমভাবে উপেক্ষিত হয়—

> আরশাদ আলীর বিপক্ষদলের কেন এ-বিয়েতে মত ছিলো না সেকথাও আফসারউদ্দিন ভাসা ভাসা শুনতে পেয়েছিলো। যা শোনে নাই তা কল্পনা করে নিতে তার অসুবিধা হয় নাই। বিপক্ষদলের আপত্তির কারণ ছিলো আফসারউদ্দিনের দারিদ্র্য জর্জরিত অতি সাধারণ পারিবারিক পটভূমি। (ওয়ালীউল্লাহ্‌, ২০১৩, পৃ. ৩৭১)

হাসিনা 'পুরুষতন্ত্র' আর আফসারউদ্দিন 'অভিজাততন্ত্র' নামক শেকলে বন্দি হলেও শেষ পর্যন্ত বিচ্ছেদের মাধ্যমে মুক্ত হয়। মা মরিয়ম বেগমের মূল্যবোধের ছায়ায় বেড়ে ওঠা কন্যা হাসিনা মায়ের পথেরই অনুসারী হয়। এভাবেই যেন বিচিত্র প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে নারীতন্ত্রের এক ধরনের মুক্তি ঘটে। এই নারীদ্বয় যেন পুরুষের প্রতি নির্মম কঠিন এক উদাসীনতার প্রতীকী ঢাল হয়ে দণ্ডায়মান।[৪] সংসারে শুধু নারী নয়, পুরুষও ভয়ংকর মানসিক পীড়নের শিকার হয়। "দুইতীর" এ আরশাদ আলী এবং আফসারউদ্দিন নামক দুই পুরুষের অসহায়ত্ব তাদের মানসিক চেহারায় নগ্নভাবে উন্মোচিত যখন আরশাদ আলী উপলব্ধি করেন–

'জীবন তাকে শূন্যপাত্রই ফিরিয়ে দিয়েছে। তার জন্যে তিনি তার পরিবারকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করান।' (ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১৩, পৃ. ৩৬৭)

অন্যদিকে আফসারউদ্দিনের আত্মপ্রশ্ন–

'তবে যে-কথা তাকে সবচেয়ে বেশি বিচলিত করে সে কথা এই : কেন তার প্রতি হাসিনার সামান্য স্নেহমমতার আভাসও দেখা দেয় নাই?' (ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১৩, পৃ. ৩৭১)

আত্মপ্রশ্নে ক্ষতবিক্ষত আফসারউদ্দিন–

> তাতে তার কিন্তু দুঃখ হয় না। কারণ সে বুঝতে পারে যে, সেসব কথা বলা সহজ নয়। বলতে গেলে তার অন্তরটাকে সম্পূর্ণভাবে উলঙ্গ করতে হবে তাকে। তেমনভাবে মনকে উলঙ্গ করার সাহস তার আর নাই যেন। যে মানুষ এত কাছে শুয়েও এত দূরে, সে মানুষকে সে কী করে তার অন্তর দেখায়? (ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১৩, পৃ. ৩৭২)

জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত রয়ে সয়ে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়ালেও রক্ত-মাংসের মানুষ আফসার উদ্দিন প্রেমিক হিসেবে হৃদয়ের টানাপোড়েনে এখনও অপরিপক্ব, এখনও নাজুক। প্রেমের অনুভূতির প্রশ্নে জীবনানন্দ দাশের মতো যেন নিজের সঙ্গে অব্যক্ত বোঝাপড়া–

'কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে!' (জীবনানন্দ, ১৯৯৪, পৃ. ১১৯)

গল্পটিতে পুরুষের প্রতি নারীর ঔদাসীন্য, হিমশীতল আচরণ যেন পুরুষতান্ত্রিকতার কড়া চোখ-রাঙানিকে চরম নির্লিপ্তভাবে নাকচ করে দেয়। এই নৈঃশব্দ্য, নির্বিকারবোধ এতো ধারালো এতো শ্বাসরুদ্ধকর যে সেখানে পুরুষের কথা রুদ্ধ হয়ে এক অসহনীয় পরিস্থিতি তৈরি হয়। পুরুষ যেখানে চরম অসহায়।

সমকালীন মুসলিম সমাজ, তাদের আত্মাভিমান, আভিজাত্যবোধের অক্টোপাসে, নারীদের অন্দরমহলের সৌন্দর্য করে, সুশোভিত মুক প্রাণী করে রাখত। লেখক যেন মা-মেয়ের অসহনীয় নির্লিপ্ততা ও নীরবতার মধ্য দিয়ে সেই অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন।

যে নারী যে মা, কন্যাকে জন্ম দিয়েছেন, তার মতামতকে উপেক্ষা করে পুরুষ-পিতা কন্যা হাসিনাকে পাত্রস্থ করেন। একসময় চিরতরে স্বামীর সংসার ত্যাগ করার মধ্যে দিয়ে নারী যেন, পুরুষের নির্মম শাসনের বেড়ি ছিঁড়ে বের হয়ে আসে। বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখায় পুরুষশাসিত সমাজকে। এভাবেই নারীর অনুচ্চ কণ্ঠ পুরুষের উচ্চ কণ্ঠকে রোধ করে। যদিও আত্মমুগ্ধ পুরুষ সমাজের প্রতিভূ আফসারউদ্দিনের আত্মপ্রবোধমূলক স্বগতোক্তি—

'আমি আরশাদ আলী সাহেব নই। আমরা একই ধাতুতে তৈরি নই।' (ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১৩, পৃ. ৩৭৫)

"একটি তুলসীগাছের কাহিনী" দেশভাগের বিপর্যস্ত সময়ে অনিকেত তিন যুবকের হিন্দু কর্তার শূন্য বাড়িতে আশ্রয় এবং সেখানে অবহেলায় জঞ্জালের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা মঙ্গল নির্দেশক আরাধনার আরাধ্য 'তুলসী' গাছকে কেন্দ্র করে যুগ যুগ ধরে চর্চিত ধর্মীয় মূল্যবোধের নেপথ্যে ঐ তিন মুসলিম যুবকের সব হীনতার ঊর্ধ্বে অসাম্প্রদায়িক ভাবনার সুপ্ত বিচ্ছুরণ গল্পটির মূল উপজীব্য। কাটা দেশের তীক্ষ্ণ আঁচড়ে ক্ষত-বিক্ষত দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া হিন্দুকর্তার পরিত্যক্ত বসতভিটায় আঁখড়া বেঁধেছে তিন মুসলমান যুবক। এই তিন যুবক এখানে দেশভাগের বাস্তবতায় উদ্বাস্তু জনগণের প্রতীকী রূপ। শূন্য বাড়িটি যেনো দেশচ্যুত বাসিন্দাদের আত্মার হাহাকার।

হাসান আজিজুল হক-এর *আত্মজা ও একটি করবী গাছ* গল্পের অন্নের ক্ষুধায় কন্যাকে বিক্রি করে দেওয়া বুড়োর উপলব্ধি—

'দেশ ছেড়েছে যে তার ভেতর-বাহির নেই। সব এক হয়ে গেছে।' (মোস্তফা, ২০১৭, পৃ. ১০৭)

কিন্তু এই তিন যুবক বাস্তুচ্যুত সর্বস্বান্ত হয়েও দেশ ছাড়েনি। পুরনো জীবনে ফেরা হবে কী না তারা জানে না! কিন্তু স্বপ্নবাজ এই যুবকরা তবুও স্বপ্ন ছাড়ে না। যদিও এখানে বয়স এবং পরিস্থিতির নির্মমতাও গুরুত্বের দাবি রাখে। প্রতিটি মানুষের ভেতরে গোপন এক গৃহী মানুষ বাস করে। যে খোলা আকাশের নিচেও কল্পনার ফানুস ওড়ায়। তিন যুবকের একজন মতিন সেই গৃহী পুরুষ। এই বিরান সময়েও সে স্বপ্ন দেখে–

> তার বাগানের বড় শখ, যদিও আজ পর্যন্ত তা কল্পনাতেই পুষ্পিত হয়েছে। একটু জমি পেলে সে নিজেই বাগানের মত করে নিতো। ...তারপর সন্ধ্যার পর আপিস ফিরে সেখানে বসতো। ...আমজাদের হুকার অভ্যাস। বাগানের সম্মান বজায় রেখে সে না হয় একটা মানানসই নলওয়ালা সুদৃশ্য গুড়গুড়ি কিনে নিতো। কাদের গল্পপ্রেমিক। ফুরফুরে হাওয়ায় তার কণ্ঠ কাহিনীময় হয়ে উঠতো। (ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১৩, পৃ. ৩৭৮)

খণ্ডিত দেশের নির্মম রাজনীতির শিকার এই যুবকদের অনিশ্চিত বিরামহীন পথ হাঁটা জীবনে আপাত শীতল বারিধারা নিয়ে আসে পরিত্যক্ত শূন্য বাড়িটি। কিন্তু তাদের শান্তিতে বাধ সাধে তাদেরই সঙ্গী মোদাব্বেরের চোখে পড়া মৃতপ্রায় তুলসী গাছটি। জঞ্জালের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা জীর্ণপ্রায় তুলসী গাছটি নিজেই একটি স্বতন্ত্র চরিত্র হয়ে ওঠে। হিন্দুত্বের প্রতীক হয়ে তুলসী গাছটি শরণার্থী মুসলিম যুবকের মন-মস্তিষ্কে প্রতিহিংসার আগুন জ্বালিয়ে দেয়–

> দেখছো না? কেমন বেকায়দা আসনাধীন তুলসী গাছটা দেখতে পাচ্ছো না? উপড়ে ফেলতে হবে ওটা। আমরা যখন এ-বাড়িতে এসে উঠেছি তখন এখানে কোন হিন্দুয়ানির চিহ্ন আর সহ্য করা যাবে না। (ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১৩, পৃ. ৩৮১)

অথচ মোদাব্বের নিজে গাছটি উপ্‌ড়ে ফেলে না; শুধু আস্ফালন করে যায়। বাকিরাও তোলে না। কে একজন অলক্ষে গাছের গোড়ায় জল দিচ্ছে। সজীব পাতা বার বার তার জানান দিচ্ছে। ধর্মের বেসাতি করে *দেশভাগ* হলেও ধর্ম নির্বিশেষে একসঙ্গে লতায়-পাতায় বেড়ে ওঠা অতীত যেন তারা ভুলতে পারে না। শেষপর্যন্ত এই যুবকত্রয় অন্যের ধর্মানুভূতিতে আঘাত করতে

পারে না। এই গোপন মানবিকবোধ সহস্রবছর একসঙ্গে যাপিত জীবনে অভ্যস্ত হিন্দু-মুসলমানের জন্মভূমিকে খণ্ডায়নের বিরুদ্ধে নীরব প্রতীকী প্রতিবাদ। দেশভাগ, দাঙ্গা মানুষের প্রাণের উৎসব কেড়ে নিতে পারে না। পরিত্যক্ত হিন্দু বাড়িটায় মুসলমান যুবকদের খোশগল্প, রন্ধনের আয়োজন সেই বিশ্বাস যেন ব্যক্ত করে। বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ পুরুষের মনোজাগতিক জীবনকে বিন্যস্ত করেছেন। কাহিনির বুননে লেখক কখনো নিঃসঙ্গ, কখনো সংসার আকাঙ্ক্ষী, কখনো নির্মমভাবে লম্পট, নিষ্ঠুর, কখনো পিতৃত্ববোধে কাতর, কখনওবা সাধারণ একজন পুরুষের ভাবনার আলোকে জীবনের গভীর দার্শনিক বোধকে জাগ্রত করে তোলায় সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু *একটা* "তুলসী গাছের কাহিনী" গল্পের ভেতর দিয়ে তিনি যেনো লিঙ্গান্তরের ঊর্ধ্বে মানুষ হিসেবে নারীর মতো পুরুষেরও সংসার-জীবনের তীব্র সাধ এই তিন যুবকের রান্না-বান্না, সংসার সাজানোর, ঘরকন্যার প্রয়াসের মধ্য দিয়ে দৃশ্যমান হয়ে ওঠেছে। প্রত্যেক পুরুষের অন্তরে যে একজন নারীর বাস আছে, চিরন্তর এই বিশ্বাসও যেনো সত্য হয়ে ওঠে। দেশভাগের বিপর্যস্ত অনিশ্চিত জীবনের মধ্যে দাঁড়িয়ে সংসার জীবনের ছোট্ট ছোট্ট সাধ-আহ্লাদের মধুময় দৃশ্য পাঠকের অন্তরকে শীতল পরশ দিয়ে যায়। গল্পটিতে জনতাও একটি পৃথক চরিত্র। দেশভাগকালীন পরিবেশ পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে ধারণা করা যায় যে, গল্পকার বর্ণিত রাস্তার ওপারে উৎসুক জনতার বৃহদাংশই পুরুষ। এই পুরুষ-জনতার কৌতূহলী চোখ ব্যক্তির অন্দরমহলের অসহায়ত্ব দেখে নির্দ্বিধায় মজা লুটে। লেখক সেই সত্যে আলো ফেলেছেন–'তবে রাস্তায় কিছু লোক জড়ো হয়েছে। অন্যের অপমান দেখার নেশা বড় নেশা।' (ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১৩, পৃ. ৩৮৪)

পুলিশের আগমন, বাড়ি ছাড়ার নোটিশ প্রাপ্তির পর তুলসী গাছে জল ঢালা বন্ধ হয়ে যায়। লেখক এই নিষ্ঠুরতার কারণ মানুষের কাছে অন্বেষণ করতে বলেছেন–'কেন পড়েনি সেকথা তুলসী গাছের জানবার কথা নয়, মানুষেরই জানবার কথা।' (ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১৩, পৃ. ৩৮৫)। মানুষ জানে, জেনে উপেক্ষা করে, ভুলে থাকে। মানুষ তো এমনই কারণ জন্মগতভাবেই মানুষ স্বার্থপর। জীবন যেখানে অনিশ্চিত, অনিরাপদ, মানবিকতা যেখানে পদদলিত সেখানে তুলসী গাছের বেঁচে থাকার অধিকার যেন তাদের কাছে চরম তুচ্ছ, অতিরঞ্জিত ভাবনা বৈ আর কিছু না।

পুরুষতন্ত্রের পৌরুষ, ক্ষমতা আর প্রবৃত্তির প্রতীক "পাগড়ি"। প্রৌঢ় আইনজীবী মোত্তালেব সাহেব তার খায়েশের পক্ষে অনবরত যুক্তি দাঁড় করিয়ে নিজের বয়ানের সাক্ষী নিজেই হন–

> তিনি বয়সের ভার তো বোধ করেনই না, তিনি যুবকের তেজ-বলের অধিকারী বলেই মনে করেন। এখনো তাঁর শরীরের বাঁধন শক্ত, তার মেরুদণ্ড ঋজু। তাঁর দেহে এখনো শক্তি আছে, মনেও আশা আছে। (ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১৩, পৃ. ৩৮৫)

এভাবেই আইনজীবী মোত্তালেব সাহেব ঘরে পাগল স্ত্রী, বিবাহযোগ্য কন্যাদের রেখে বিয়ের বর সাজেন। মেয়ের বয়সী নারীকে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে আসেন। এই বিয়েতে তিনি কারও অনুমতি নেয়ার প্রয়োজনবোধ করেন না। প্রৌঢ় মোত্তালেব হোসেন দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করা উপলক্ষ্যে "পাগড়ি" পরার সাধ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। সবার অলক্ষে তিনি পাগড়িটা সঙ্গে নেন কিন্তু শেষপর্যন্ত লোকলজ্জার ভয়ে পরতে পারেননি। পরবর্তীকালে দেখা যায় মুষলধারে বৃষ্টিতে ভিজে নববধূসহ বর মোত্তালেব সাহেবের গৃহে প্রত্যাবর্তন। সব ভিজে গেলেও *পাগড়ি* অক্ষত অবস্থায় ফেরত আসে–

> তবে একটা জিনিস ভেজে নাই। সেটা মোত্তালেব সাহেবের দামি মাসহাদী পাগড়ি।
>
> যেমনি গিয়েছিলো তেমনি সেটি হাতবক্সে লুকিয়ে ফিরেছে। (ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১৩, পৃ. ৩৯১)

সামন্ততান্ত্রিক মুসলিম সমাজের বিত্তশালী পরিবারের পুরুষদের প্রভাব প্রতিপত্তি, স্বেচ্ছাচারিতা, গুপ্ত খায়েশের গতিশীল প্রক্রিয়া অব্যাহত, এই সত্যে আলো ফেলার জন্য লেখক এখানে পাগড়িটাকে অক্ষত রাখেন। এই অক্ষত পাগড়িটাই পুরুষশাসিত সমাজের শ্রেষ্ঠত্বের, ক্ষমতায়নের বরপুত্র, প্রতিপত্তির প্রতীক। মোত্তালেব হোসেন উক্ত গল্পটিতে পুরুষ-শাসিত সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী একটি চরিত্র। পাশাপাশি সমাজে একজন পুরুষের জন্য যৌন চাহিদা চরিতার্থ করা যে কত অনায়াসলব্ধ এই নগ্ন সত্যও এখানে উন্মোচিত হয়েছে।

গভীর পিতৃত্ববোধ আর মানবিকতাবোধের যোগহীন যোগের এক অসাধারণ কাহিনি "কেরায়া" ও "জাহাজী" গল্পদ্বয়। "কেরায়া" গল্পে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় অপেক্ষমান মুমূর্ষু বুড়ো শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে চায় নিজালয়ে তাই ঘরে স্বজনের কাছে ফেরার জন্য অচেনা নৌকায় আশ্রয় নেয়। নারীর মাতৃত্বের মতো পুরুষের পিতৃত্বও এক শাশ্বত অনুভূতি। পায়ের কাছে শুয়ে থাকা এতিম ছেলেটিকে দেখে মৃত্যু-পথযাত্রী বুড়োর মনে পড়ে যায়, সাপে কাটা মৃত আত্মজের কথা।

যেখানে মৃত্যুভীতি অস্পষ্ট হয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, সন্তান হারানো পিতার আমৃত্যু বেদনাভার আর এতিম ছেলেটির জন্য মমত্ববোধ—

> ডিবের অস্পষ্ট আলোয় কিছুটা বিস্মিত হয়ে দেখে, তার পায়ের কাছে এতিম ছেলেটা শুয়ে। সে তার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপর সে তার ছেলেদের কথা ভাবে। বিশেষ করে সেই ছেলেটার কথা যাকে সাপে কেটেছিলো। তার বয়সও এতিম ছেলেটির মতোই ছিলো। (ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১৩, পৃ. ৩৯৪)

"কেরায়া" গল্পের পুরুষ চরিত্রগুলো জীবন যন্ত্রণার নিষ্পেষণে বিপর্যস্ত। বেঁচে থাকার চেষ্টায় অসহনীয়ভাবে মরিয়া এই মানুষগুলোর কাছে মৃত্যু যেন তুচ্ছ এক ছায়া মাত্র। তাই নৌকায় আশ্রয়গ্রহণকারী মৃত্যু-পথযাত্রী বুড়োকে নিয়ে তারা নিষ্ঠুরভাবে নির্লিপ্ত। ভীষণ অসহ্য এক অনুভূতি নিয়ে লেখক দেখিয়েছেন, কী ভয়ানক নির্দয়ভাবে জীবনের নির্মমতার কাছে মৃত্যুর নিষ্ঠুরতা হার মানে—

'এবং দিনের আলোয় মাঝি দু'জন বুড়ো লোকটির দিকে তাকিয়ে বোঝে, সে আর জীবিত নাই। তারা হাই তোলে।' (ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১৩, পৃ. ৩৯৬)

অন্যত্র,

> একজন উঠে ছই-এর ভেতরে ঢুকে লাশটির প্রায় গা-ঘেঁষে শুয়ে পড়ে। উরুর মধ্যে তার হাত দুটি সে স্থাপন করে, তারপর আকাশ বরাবর দৃষ্টিহীন চোখে তাকিয়ে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না ঘুম আসে। (ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১৩, পৃ. ৩৯৬)

জাগতিক জীবনের অবর্ণনীয় নির্দয়তা তাদের অবরুদ্ধ অনুভূতির সীমানায় জন্ম-মৃত্যু, দেহ-লাশ সবই সমান হয়ে গেছে। পুরুষ মাঝিরা অজানা মৃত্যুকে নিয়ে নির্লিপ্ত কিন্তু তবুও দৃশ্যমান জীবনের দায়িত্ব এড়িয়ে যায় না—

> বুড়ো মানুষটির লাশ কাঁধে করে এবার ওরা পাড়ে ওঠে ধীরমন্থর গতিতে গায়ের দিকে রওনা হয়। পেছনে তাদের একটি মিছিল লাগে; অন্ধকারের

> মধ্যে লণ্ঠনের আলো হেলে-দোলে। কেবল এখন বউ-ঝিরা কেমন মুখ খুলে কাঁদে। একটি বুড়ি বিলাপ করে। (ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১৩, পৃ. ৩৯৭)

ক্রূর জীবন পুরুষকে অনুভূতিহীন করে দেয়। এই কঠিন সত্যের পাশাপাশি আরেকটি বাস্তবতা হলো, সমাজের অলিখিত নিয়ম, পুরুষের আওয়াজ করে কাঁদা নিষিদ্ধ। জনসমাজে তাদের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে রাখতে হয়, কারণ ব্যর্থ হওয়া যেন তাদের পৌরুষত্বের অপমান। তবে নারী মা, তারা সৃষ্টি করে। তাই তারা পুরুষের তুলনায় অনেক গভীর অনেক তীব্রভাবে সংবেদনশীল। এই গল্পে সেই বিশ্বাসও প্রতীয়মান। *কেরায়া* গল্পের মৃতপ্রায় বুড়োর পিতৃত্বানুভূতির আরেক সহমর্মী *জাহাজী* গল্পের বৃদ্ধ করিম সারেঙ—

> তার জীবনে যদি গ্রন্থি পড়তো তবে চিরন্তন সত্য হলো, ছাত্তারের মতো এমনি একটি ছেলে এমনিভাবে দাঁড়াতে পারতো তার সামনে। (ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১৩, পৃ. ৩২০)

অথচ বুড়োর স্নেহের ভার এতিম ছেলেটি নিতে পারেনি। কারণ তার উদরে ছিল অসহ্য ক্ষুধার টান। আবার ছাত্তারও বৃদ্ধ করিম সারেঙ্গের আপত্য স্নেহ অনুভব করতে পারেনি। কারণ তার ছিল পরিবারের কাছে ফিরে যাবার আকুতি। দুই বৃদ্ধের জীবনের অনিঃশেষ নিঃসঙ্গতা কোথাও না কোথাও যেন এক গ্রন্থিতে গাঁথা।

“নিষ্ফল জীবনযাত্রা”র বৃদ্ধ সদরউদ্দিন মৃত্যুর পূর্বে মানুষের দ্বারে দ্বারে ক্ষমা ভিক্ষা করে। তার এ ভিক্ষা আপাত ব্যর্থ হয়। কারণ সমাজ মুমূর্ষু বৃদ্ধের ক্ষমা চাওয়াকে সহজভাবে মেনে নিতে পারে না। সংসারী মানুষ তারা অমঙ্গলের ভয়ে শংকিত—‘ভীতি-শঙ্কা ক্রমশ বাড়তে থাকে। মৃত্যুকে পিঠে নিয়ে কেন সে মানুষের বাড়ি-ঘরে-দুয়ারে-ভিটেতে অমঙ্গলের ছায়া ফেলে হাঁটছে?’ (ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১৩, পৃ. ৪০০)

অন্যত্র, ‘সদরউদ্দিন পথে-পথে হাঁটছে এবং প্রতি বাড়িতে অকল্যাণ-অমঙ্গলের ছায়া ফেলছে।’ (হোসেন, ২০১৩, পৃ. ৪০০) অপ্রতিরোধ্য জীবন, অনিবার্য মৃত্যুকে দূরে সরিয়ে রাখতে, ভুলে থাকতে মরিয়া। বৃদ্ধ সদরউদ্দিনের উপস্থিতি যেন বহুদিন ভুলে থাকা, লুকিয়ে রাখা মৃত্যুর নগ্ন অবয়ব দর্শনের আশংকা আশপাশের মানুষগুলোকে তীব্র শংকিত করে দেয়। বৃদ্ধ সদরউদ্দিনের সেই অত্যাশ্চর্য অন্তিম খেয়াল শেষপর্যন্ত পূর্ণ হয় ছোটবেলার বন্ধু আখলাকের চোখের জলে। কারণ যৌবনে সদরউদ্দিনের কারণে আখলাক পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়। বৃদ্ধের শেষ

ইচ্ছাকে লেখক এখানে অনেকটা 'খেয়াল' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এই চিহ্নিতকরণের সঙ্গে সচেতন পাঠকমাত্র সৌম্যমূর্তি প্রৌঢ় ব্যক্তিটির প্রশ্নের যোগসূত্র খুঁজে পান–

> দাঁড়ান দাঁড়ান। সৌম্যমূর্তি প্রৌঢ় ব্যক্তিটি আবার বলে। তার কণ্ঠে এবার উষ্ণতার ভাব। বলি খোদার কাছে মাফ চেয়েছেন? (ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১৩, পৃ. ৪০২)

মানুষের মানবিক চিন্তা ও ধর্মীয় বিশ্বাস এই দুটো মনস্তাত্ত্বিক অবস্থানকেও লেখক এখানে মুখোমুখি দাঁড় করেছেন। কারণ জীবনের একটা সময়ে যখন মানুষের মনে মৃত্যু চিন্তা ভর করে তখন মৃত্যু পরবর্তী নরকযন্ত্রণার ভয়ও তাকে তাড়িত করে। মুমূর্ষু সদরউদ্দিন, জাগতিক জীবনের সকল পাপ মোচন করে বেহেশতের পথ সুগম করতে মরিয়া ছিলেন। তাই শৈশবের বন্ধু আখলাকের কাছে মাফ চাওয়া তার কাছে বেহেশতের পথ সুগমেরও একটি আশা হিসেবে এখানে চিহ্নিত করা যায়। পুরুষশাসিত, শোষিত এই সমাজে নানা শ্রেণির লম্পট বিরাজমান। তাদের ধর্মের ফতোয়ায় বশীভূত হয়ে মাথামোটা সমাজপতিরা নিজেদের অজান্তে নিজের ও পরিবারের সর্বনাশ করে ফেলেন। "গ্রীষ্মের ছুটি" গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র নয় বছরের বালিকা সেলিনা বিবি, দাদার বাড়ির আশ্রিত আম-মৌলবী দ্বারা মানসিক ও শারীরিক পীড়নের শিকার হয়ে স্বাভাবিকত্ব হারিয়ে ফেলে। পরিবারের কর্তা দাদা সাহেবের ধর্মান্ধতা, ভূত-প্রেত, তাবিজ-কবজে বিশ্বাস, সেলিনার সঙ্গে সংঘটিত ঘটনার সত্যকে খোঁজার চেষ্টা না করে আম-মৌলানার কূটচালে, তার চুল কেটে, তাবিজ পরিয়ে দেয়া হয়। এই নিষ্ঠুরতা নয় বছরের বালিকা সেলিনা বিবির স্বাভাবিক জীবনাচরণে নীরবে নির্মম আঘাত হানে। ধর্মের মুখোশে অধর্মের বেসাতি করে অন্ন সংস্থানে তৎপর চতুর শিকারী তথাকথিত আম-মৌলবী। নিঃসঙ্গ নিমগাছের ছায়ায় শিশু সেলিনার ফর্সা পেলব মসৃণ গালে নিমের ডালের আঘাতে স্পষ্ট হয়ে থাকা রক্তকণিকা দেখে, ধর্ম ভুলে রক্তের স্বাদ নিতে হঠাৎ তার পশু অন্তর জেগে ওঠে–

> তারপর সহসা যেন মস্তিষ্কশূন্য হয়ে সে একটি অদ্ভূত কাণ্ড করে বসে। ক্ষিপ্রভঙ্গিতে সেলিনার সামনে উবু হয়ে বসে তার গালের ক্ষতস্থানে মুখ দিয়ে সে চুষতে থাকে ক্ষতস্থানটি। (ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১৩, পৃ. ৪১০)

কামুক পুরুষের যৌন উত্তেজনা কীভাবে একটি নারী-শিশুর কোমল অন্তরকে বিপর্যস্ত করে ফেলে এই দৃশ্য উপস্থাপন করেই লেখক ক্ষান্ত হননি। এই লম্পট আম-মৌলবী একটি সত্যকে

আড়াল করতে গিয়ে হাজারটা মিথ্যার পাহাড় জমিয়ে কীভাবে শিশু সেলিনার জীবন অস্বাভাবিকতার পথে ঠেলে দেয় তারও প্রকাশ ঘটান–

> সে দ্বন্দ্বের জন্যেই হয়তো যখন সে ছুটির শেষে শহর প্রত্যাবর্তন করে তখন তার মুখ রক্তশূন্য ফ্যাকাসে দেখায়। (ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১৩, পৃ. ৪১২)

সেলিনার রক্তশূন্য, ফ্যাকাসে মুখ আসলে পুরুষশাসিত এই সমাজের শোষণের চিহ্ন। কারণ ধর্মান্ধ দাদাসাহেব এবং তার সমাজ ঘটনার গভীরে না পৌঁছে মৌলবীর মিথ্যা কাহিনির ধুম্রজালে নিজেদের স্বাভাবিক বিবেকবোধ, সাধারণ জ্ঞান বিসর্জন দেয়। ফলে শিশুকন্যা সেলিনা বিবির কাঁধে ভর করে সারাজীবনের জন্য একটি অন্ধকার অতীত। কাজী ইমদাদুল হক-এর *আবদুল্লাহ* উপন্যাসের বড়কর্তা ধর্মান্ধ সৈয়দ আবদুল কুদ্দুস অসুস্থ পুত্রবধূকে তাবিজে শৃঙ্খলিত করেন, পাশাপাশি এ্যালোপেথিক চিকিৎসা হারাম এই বিশ্বাসে, অ্যালোপেথিক চিকিৎসা নিতে প্রচণ্ড বাধা দেন। কিন্তু আধুনিক যুগের পুরুষ শিক্ষিত আবদুল্লাহ তার সকল আপত্তিকে নাকচ করে স্ত্রীর শরীরকে তাবিজের ভারমুক্ত করে অ্যালোপেথিক চিকিৎসা করিয়ে তাকে সুস্থ করেন। শাহেদ আলীর "নানীর ইন্তেকাল" গল্পেও মুসলমান সমাজে ধর্মান্ধতা নামক সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। কিন্তু শেষপর্যন্ত ধর্মের অন্ধত্বের চিকিৎসা তাবিজ-কবজ, পানি পড়া নাকি আধুনিক চিকিৎসায় একমাত্র বংশধর ওয়ারেস সুস্থ হয়ে ওঠে, এই মানসিক সংকট নানীকে নানা প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। নানীর অন্ধ ধর্ম বিশ্বাসের ভিত নড়ে ওঠে–'ভয়ের কিছু নই, অবিচলিত কণ্ঠে ডাক্তার আশ্বাস দেন নানীকে–আল্লাহ্‌র ফজলে...বিশ্বাসে অবিশ্বাসে মিলিয়ে সবকিছু ঘুলিয়ে যায় নানীর।' (শাহেদ, ২০০১, পৃ. ৫২)

জর্জ বার্নাড শ-এর বিখ্যাত উক্তি এখানে প্রণিধানযোগ্য–'Beware of the man whose God is in the skies'. (Bernard, 2013 p. 81)

মালেকা গল্পের প্রধান শিক্ষয়িত্রী, মালেকাকে উদ্দেশ করে নিজস্ব মনোভাব ব্যক্ত করেন–'স্বামীরাও স্ত্রীমানুষের মতো গল্প করে বেড়ায়। একবার ইস্কুলের বদনাম উঠলে আর রক্ষা থাকবে না।' (ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১৩, পৃ. ৪১৬) পুরুষতন্ত্রের প্রতিভূ প্রধান শিক্ষয়িত্রী, পুরুষকর্তৃক আরোপিত স্ত্রী চরিত্রের বৈশিষ্ট্যে অঙ্গুলি প্রদর্শন করে, নিজের নারী সত্তাকেই অপমান করেছেন।

শাহেদ আলীর “আতশী” গল্পের নিরক্ষর মালেকা, ধর্মের বাণিজ্য করে নিরীহ মানুষকে ঠকিয়ে অবৈধভাবে অর্থ উপার্জনকে তীব্র ঘৃণাস্বরূপ স্বামীর ভিটায় নিজের দেহ আগুনে পুড়িয়ে আত্মহত্যা করে। পুরুষেরই দেওয়া সং আর অসারের সংসার আর তার স্ত্রী নামক পরিচয়কে অগ্নিহুতি দেওয়ার মাধ্যমে এই পুরুষশাসিত সমাজের ভণ্ডামির চরম প্রতিবাদ করে। নিরক্ষর মালেকা যেখানে ধর্ম বিক্রি করে সুদ নিয়ে সংসারে আসা খোরাকির তীব্র প্রতিবাদ করে সুদের হারাম অর্থে ক্রয়কৃত অন্ন খেতে ঘৃণা জানায়; সেখানে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র গল্পের শিক্ষয়িত্রী মালেকা অন্যায়ের কোন প্রতিবাদ করে না। এমনকি তার উপর সংঘটিত অন্যায়েও সে নীরব থাকে। “লালসালু” উপন্যাসের জমিলা এই লালসালু আবৃত কবরকে, মজিদের মাজারকে ধান্দাবাজির ব্যবসা হিসেবে সাহসী প্রতিবাদ করেছে–

> ঝাপটা খুলে মজিদ দেখলো লাল কাপড়ে আবৃত কবরের পাশে হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়ে আছে জমিলা। চোখ বোজা, বুকে কাপড় নাই। ...আর মেহেদি দেয়া তার একটা পা কবরের গায়ে লেগে আছে। পায়ের দুঃসাহস দেখে মজিদ মোটেই ক্রুদ্ধ হয় না; এমন কী তার মুখের একটি পেশিও স্থানান্তরিত হয় না। (ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১৩, পৃপৃ. ৮৭-৮৮)

মজিদের ক্রুদ্ধ না হবার কারণ হচ্ছে, সে জানে তার ঘৃণ্য কর্মকাণ্ড চরম অপরাধের কথা। সে জানে এ কবর মিথ্যা। ধোঁকাবাজির মাধ্যমে শুধু জীবিকা নির্বাহের অবলম্বন হিসেবে নির্মিত।

এই পুরুষতান্ত্রিক মুসলিম সমাজে নারী যে কত তুচ্ছ এই বাস্তবতায় আলো ফেলা সম্ভবত *মালেকা* গল্পে লেখকের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। পুরুষের আধিপত্য ব্যাধির মতো সমাজের দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সংক্রমিত। নারী-পুরুষের যোগ্যতার মানদণ্ড নিরূপণের চরম ভণ্ডামি লেখক “মালেকা” গল্পে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন–

> মালেকা ছোটবেলায় কোরআন-হাদিস পড়েছে মৌলবীর কাছে। তারপর মাইনর পাশ করে দীর্ঘ ঘোমটা তুলেছে গর্ব ঢাকবার জন্য। ...তারপর সে মেয়েরই বিয়ে হয় তোজাম্মল তরফদারের সঙ্গে। ছেলেটি তখন গ্রামের মাতা বাগ্‌বাদিনী উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে বার কয়েক মেট্রিক ফেল করে ঘরে বসে আছে। বসে আছে কথাটা তখন

> প্রশংসনীয় ব্যাপারই ছিল। যাদের জমিজমা আছে, যাদের আর্থিক সমস্যা নাই, তারা এমন বসে থাকতে পারতো। (ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১৩, পৃ. ৪১৭)

এভাবেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তৎকালীন পুরুষ নিয়ন্ত্রিত সমাজে নারীর নানাভাবে নিগৃহীত হওয়ার ঘটনা মৌলিক বিষয় হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। সমকালীন কূপমণ্ডূক মুসলিম সমাজ অগণিত সন্তান জন্ম দেওয়া, কাজ না করে আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করে বসে থাকাকে ‘রিজিক’ হিসেবে মেনে নেয়া, অ্যালোপেথিক চিকিৎসা হারাম ইত্যাদি অন্ধবিশ্বাস আঁকড়ে জীবন অতিবাহিত করার সুপ্রচুর দৃষ্টান্ত কাজী ইমদাদুল হকের *আবদুল্লাহ্* (১৯১৮), নজিবুর রহমানের *আনোয়ারা* (১৯১৪), শাহেদ আলীর *জিবরাইলের ডানা* (১৯৫৩)-সহ সাম্প্রতিক কালের শক্তিমান লেখক আবুল বাশারের *ফুল বউ* (১৯৮৮) প্রভৃতি গ্রন্থে নানাভাবে উল্লেখ আছে। স্বয়ং ওয়ালীউল্লাহ্ মুসলিম সমাজের এই আদর্শের নামে উগ্রতা, অন্ধত্ব, রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে আমৃত্যু কলম সচল রেখেছেন। মুসলমানদের অতীত ঐতিহ্য নিয়ে তিনি যেমন সব সময় গর্ববোধ করতেন তেমনি সমকালে তাদের পশ্চাৎপদ মানসিকতা তাকে প্রচণ্ড ব্যথিত করত। ব্যক্তিগত জীবনেও তার কারণ অনুসন্ধানে তিনি সবসময় তৎপর ছিলেন–

> আন-মারি বলেন, আমরা বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতাম...হিন্দু মুসলমানের বিরোধের মূল কারণ নিয়ে কথা বলতেন। ধর্মীয় সংকীর্ণতা হিন্দুদের বর্ণপ্রথা, মুসলমানদের অনগ্রসরতা, ধর্মীয় গোঁড়ামি, অগ্রসর হিন্দুনেতাদের নির্মম স্বার্থপরতা ও সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি সব আলোচনায় আসত। (মকসুদ, ২০১৪, পৃ. ৮৯)

তাই “মালেকা” গল্পে তিনি মুসলিম রক্ষণশীল সমাজের আরও গভীরে আলো ফেলেছেন–

‘পাশ-ফেলের মত চাকুরি পাওয়া না-পাওয়া খোদার হাতে। সে-হাত এখনো খোলে নাই।’ (ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১৪, পৃ. ৪১৭)

একদিকে ওয়ালীউল্লাহ্‌র দেখা মুসলিম পুরুষ-সমাজ নিজের অযোগ্যতাকে ঢাকার জন্য আত্মপ্রবোধে নিমজ্জিত; অন্যদিকে শাহেদ আলীর সমাজে মালেকা, হালিমার মতো নিরক্ষর নারীরও দেখা মেলে, যাদের প্রখর জীবনদৃষ্টি একনিষ্ঠ পাঠকের মনোজগৎ তীব্রভাবে নাড়িয়ে দেয়–

> হারামজাদা, তোর ভালার লাইগাই না আমার মাথা-বিষ আর তুই কিনা ফাঁকি দিতাছোস্ আমারে। আমি মরলে জিবরাইল খাঞ্চা খাঞ্চা খানা লইয়া আইবো না তোর লিগা! (শাহেদ, ২০০১, পৃ. ৬৩)

সবচেয়ে চমকপ্রদ বিষয় হচ্ছে, সমকালীন গল্পকারদের বিধৃত সমাজে ধর্মান্ধতার পরাকাষ্টায় মনোজাগতিকভাবে পুরুষরা যতটা বন্দি; নারীরা ঠিক ততটাই মুক্ত ছিল। ওয়ালীউল্লাহ্‌র নানা গল্পে ঘরে-বাইরে পুরুষের ক্ষমতার দম্ভ বিচিত্র চেহারা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। “স্তন” গল্পের বিত্তশালী সালাহ্‌উদ্দিন সদ্য মাতৃহীন সদ্যজাত এতিম নাতিকে অভাবি পরিবারের কর্তা আবদুল কাদেরের মৃত সন্তান প্রসবকারী স্ত্রীর দুধ পান করানোর অনুমতি নেয়ার জন্য বলেন–‘একটু হুকুমের কণ্ঠে বলেন, আপনার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করে আসবেন?’ (ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১৩, পৃ. ৪২৫)। এই গল্পে শেষপর্যন্ত মাতৃত্বের কাছে তথাকথিত অভিজাততন্ত্র ও ধনতন্ত্রের পরাজয় ঘটে।

“জাহাজী” গল্পের বৃদ্ধ করিম সারেঙ্গের উপলব্ধি, তার জীবনের সঞ্চয় শূন্যের ভাসমান–

> মানুষ বিয়ে করে কিছুটা জৈবিক কারণে, কিছুটা স্বপ্ন বাস্তবে রূপান্তরিত দেখবার জন্যে, তাছাড়া বৃদ্ধ বয়সে যৌন ক্ষয়ের রিক্ততা ও অসহায়তায় মানুষ ক্ষেপে ওঠে, তবুও সন্তানের মধ্যে তা সঞ্চিত হতে দেখতে শান্তি পায়। করিম সারেঙ্গ নিঃসঙ্গ। তার ক্ষয় ক্ষয়ই : তার ভাঙ্গা তীর অন্য কোথাও আর তীর গড়ছে না। (ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১৩, পৃ. ৩১৯)

বৃদ্ধ করিম সারেঙের দার্শনিক ভাবনার মাধ্যমে পুরুষ-জীবনের অন্তর্গতবোধের চিত্র প্রকাশিত হয়েছে। পুরুষের বহুগামী, বহির্মুখী জীবন এক সময় সংসার-সন্তান আর নারীতে থিতু হতে চায়। কিন্তু সবার ভাগ্যে এই সুখ জোটে না। করিম সারেঙ তার নির্দয় প্রমাণ। ব্যক্তি নিজের জীবনের অপূর্ণতার সঙ্গে অন্যের জীবনের অপ্রাপ্তির যোগসূত্র পেলে পরস্পরের মধ্যে একাত্মতার উৎস খুঁজে পায়। সারেঙ করিম তার অতীতের সঙ্গে ছাত্তারের জীবনের সাদৃশ্য কল্পনা করে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। কিন্তু এ জোয়ারে আকস্মিক ভাটা পড়ে। কেমন একটা গোপন ঈর্ষা তাকে খোঁচাতে লাগে যখন সে জানাল–

> ছাত্তারের মা আছে, বাপ আছে, তাছাড়া তিনটি বোন দুই ভাইও আছে। শুনলো সারেঙ্গ ক্ষুধার্তের মতো গোগ্রাসে শুনলো। তারপর আবার আশ্চর্যভাবে স্তব্ধ হয়ে রইলো।...সবাই রয়েছে ছাত্তারের এবং এ-সংবাদ শোনার পর আর কোন কথা বলবার নেই যেন যেহেতু তার কেউ নেই। (ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১৩, পৃ. ৩২০)

বৃদ্ধ সারেঙের উপলব্ধি, তার গোটা জীবনের হিসেব-নিকেশের খাতা শূন্য। এই অনুভূতি তার অন্তর্লোককে বিমিশ্র এক বিষাদে তচ্‌নচ্‌ করে দিয়ে যায়। যদিও জীবনের যোগফল কখনো শূন্য হয় না বরং যোগফলে পৌনঃপুনিক অব্যাহত। ছাত্তারের প্রতি স্নেহমায়া মমতা হঠাৎ যেন চরম হৃদয়হীনতার যন্ত্রণায় ঢেকে যেতে চায়। কারণ বৃদ্ধ সারেঙ্গও তো মানুষ! সে জানে ছাত্তার তার কেউ না। এই আকুতি এই টানও একতরফা। এই বাস্তবতাই চরম সত্য। এই উপলব্ধি তার অন্তর্জ্বালা বাড়িয়ে দেয়।

নিষ্ঠুর জীবনবাস্তবতা আর মনোগত তীব্র দুঃখবোধই যেন নির্দয় প্রতিক্রিয়া হয়ে প্রকাশিত হয়–'কিন্তু হঠাৎ কী হলো, সারেঙ অপ্রত্যাশিতভাবে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো; হয়তো একটা বিকৃত হিংস ঝল্‌কে উঠেছে মনে। ...ছাত্তার হতবুদ্ধি, নিশ্চল।' (ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১৩, পৃ. ৩২১)

তরুণ জাহাজকর্মী ছাত্তার বৃদ্ধ সারেঙের দৃশ্যমান অপত্যস্নেহ অনুভব করেছে কিন্তু তার অতীত জীবন, ভেতরের রক্তক্ষরণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কোনো এক তীব্র অভিমানে ঘর ছাড়া হলেও সাত্তার গৃহী মানুষ। সে সংসার জীবন, মাতা-পিতা, ভাই-বোনের স্নেহ মায়ার বেড়ে উঠেছে। বৃদ্ধ সারেঙের মতো জীবনের নৈঃশব্দ্য, নিঃসঙ্গতা, ক্রূরতা দেখেনি। বয়স এবং জীবনাভিজ্ঞতা দুই পুরুষের উপলব্ধিবোধকে দুই মেরুতে দাঁড় করিয়ে দেয়। অপ্রাপ্তির যন্ত্রণা বৃদ্ধ সারেঙকে ক্ষণিকের জন্য ঈর্ষান্বিত বেদনায় আক্রান্ত করলেও শেষপর্যন্ত পিতৃত্বের জয় হয়। যদিও সেই মমত্ববোধ উপলব্ধি করার ক্ষমতা ছাত্তারের নেই। কারণ সে সারেঙের মতো নিঃস্ব নয়। সারেঙের কোনা পিছুটান নেই কিন্তু সাত্তারের আছে। পিতার ছায়া, মাতার আদরের টানেই ছাত্তার বাড়ি ফেরার আনন্দে মগ্ন–

> সে-দলে ছাত্তারও রয়েছে। তার মুখে হয়তো মুক্তির ঔজ্জ্বল্য। তবে সে নত মাথায় নাবছে বলে ওপর থেকে তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু উপরের পানে মুখ তুলে একবার সে তাকাবে কি? রেলিং ধরে ঝুঁকে করিম সারেঙ্গ দাঁড়িয়ে রইলো প্রেতের

> মতো আবছা হয়ে– চোখ দুটো তার দীনতায় বীভৎস হয়ে উঠেছে, ও তাকালো না। (ওয়ালীউল্লাহ্‌, ২০১৩, পৃ. ৩২২)

ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের ওপর তার সম্মান অনেকাংশে নির্ভরশীল। "জাহাজী" গল্পে এই বাস্তবতার দৃষ্টান্ত মেলে। শৈশবে পিতৃ-মাতৃহীন, যৌবনে জাহাজের অভিযাত্রী বৃদ্ধ করিম সারেঙের ভেতরটা একান্ত নিজের আপন মানুষহীন, জনমানবহীন শুষ্ক কিন্তু দৃশ্যমান সমাজে বিচরণকারী মানুষের প্রতি তার মমত্ববোধ, দায়িত্ববোধের কমতি নেই। ক্ষমতা ও ব্যক্তিত্বের মুখোমুখি জাহাজিরা শেষপর্যন্ত বৃদ্ধ সারেঙের প্রতি তাদের মান্যতা স্বীকার করে। চিফ অফিসারকে তারা চাকরি হারানোর ভয়ে মেনে চলে কিন্তু শ্রদ্ধা করে করিম সারেঙকে।

প্রত্যেক মানুষের অন্তরে একজন দার্শনিকের বাস। দুঃখবোধে তার সেই দার্শনিক মন জেগে ওঠে। গোটা জীবন জাহাজে অতিবাহিত করে বৃদ্ধ করিম সারেঙের দার্শনিক সত্তা আজ আত্মপ্রশ্নের মুখোমুখি–

> স্মৃতিমন্থনে অদ্ভুত বেদনা। যে-দিন কেটে গেছে, সে-দিন আর কখনো ফিরবে না। এবং জীবন যদি ব্যর্থ হয়ে থাকে, তবে ব্যর্থই হলো। করিম সারেঙ্গের ভেতরটা যেন ফাঁপা, শূন্য, প্রচণ্ড ব্যর্থতায় রিক্ত। এবার সে-অন্তরে আবার সে প্রশ্নটি অবুঝ গোঁয়ার ছেলের মতো গুম্‌রে গুম্‌রে উঠতে লাগলো। তুমি কী দিলে আমাকে, আর আমি কী দিলাম তোমাকে। (ওয়ালীউল্লাহ্‌, ২০১৩, পৃ. ৩১৯)

কিন্তু প্রকৃতার্থে প্রতিটি মানুষের জীবনেই কোনো না কোনো সঞ্চয় আছে। ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে, সে জীবনের পাত্র শূন্য দেখবে নাকি ভরাট!

বনফুলের *মানুষ* গল্পে বেঁচে থাকার জন্য অন্নের অন্বেষণে একজন দেহকে অন্যজন রোগকে মাধ্যম করেছে–'ব্যাধি ও স্বাস্থ্য পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আছে–একই উদ্দেশ্যে। ক্ষুধার অন্ন চাই।' (বলাই চাঁদ, ২০০৫, পৃ. ৬২)

বনফুলের "মানুষ" গল্পের এই নীরব প্রতিবাদের দৃশ্যপট আরও তীক্ষ্ণ, তীব্র, স্পষ্ট হয়ে উচ্চকিত সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র "মৃত্যু-যাত্রা" গল্পে। গল্পের মৃত বুড়ো যার মৃত্যু হয় ক্ষুধায়।

তিনি মরে গিয়েও যেন মানুষের ন্যায্য অধিকার 'অন্ন' না পাওয়ার প্রতিবাদ করে গেলেন বর্ধিষ্ণু বৃক্ষের দেহে হেলান দিয়ে মৃতাবস্থায় ঠাঁয় বসে থেকে—

'প্রান্তরের ধারে বৃহৎ বৃক্ষের তলে তার গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বুড়োর মৃতদেহ বসে রইলো অনন্ত তমিস্রার দার্শনিকের মতো।' (ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১৩, পৃ. ৩৩৮) বৃদ্ধের অবয়বে যেন প্রকট হয়ে আছে শাসকের প্রতি শাসিতের কঠিন তিরস্কারে। মৃত্যুর পরেও মাটিতে মিশে না গিয়ে ঠাঁয় বসে থাকা এই সমাজের প্রতি এক ধরনের নীরব প্রতিবাদ। হেমিংওয়ের সেই বিখ্যাত উক্তি এখানে প্রতিপাদ্য—'A man can be destroyed but not defeated. (Hemingway : 1952, p. 95) ক্ষুধার যন্ত্রণায় মৃত বৃদ্ধ মরণের কাছে হার মেনেছেন কিন্তু জীবনের কাছে পরাজিত হননি। তার অবয়বে সেই প্রতিবাদ স্পষ্ট হয়ে আছে।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র ছোটোগল্পে সন্তানবাৎসল্য পিতার অবয়ব ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে নানারূপে প্রকাশিত হয়েছে। "জাহাজী" গল্পের বৃদ্ধ সারেঙ্গের ছাত্তারের প্রতি পিতার স্নেহ, "কেরায়া" গল্পের মুমূর্ষু বৃদ্ধের এতিম ছেলেটির প্রতি পিতৃস্নেহানুভূতির বাইরে আরেক ধরনের বন্ধন তৈরি হয় "খুনী" গল্পের বৃদ্ধ আবেদ দর্জি আর গ্রাম ছেড়ে পলাতক রাজ্জাকের মধ্যে। সোনাডাঙা গ্রামের মৌলবি বাড়ির ছেলে রাজ্জাকের লাঠির আঘাতে ফজু মিঞার ছেলের প্রাণ গেলে, রাজ্জাক চিরতরে গ্রাম ছেড়ে অন্তর্হিত হয়ে যায়। পরবর্তীকালে এই রাজ্জাক উত্তরবঙ্গের মহকুমা শহরের বৃদ্ধ আবেদ দর্জির কাছে আত্মসমর্পণ করে। অপ্রত্যাশিত এবং বিব্রতকর এই পরিস্থিতিতে বৃদ্ধ দর্জি যখন স্তম্ভিত ঠিক তখনই এই দুই-পুরুষ অদৃশ্য এক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে—

> —কেডা দর্জি মিঞা?
>
> দর্জি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলে না। কিন্তু তারপর বললে,
>
> —মোর ছেইলা।
>
> সিধু ময়রা প্রথমে বিস্মিত হলো, তারপর মনে পড়লো, প্রায় এক যুগ আগে দর্জির বারো বছরের এক ছেলে হঠাৎ একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে যায়, এবং তারপর থেকে তার আর কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

> ...সিধু তাকে চেয়ে চেয়ে দেখছিলো হঠাৎ শুধালো,
>
> —ওর নাম কী মিঞা?
>
> -মোমেন। (ওয়ালীউল্লাহ্‌ ২০১৩, পৃ. ৩৪১)

হারানো ছেলের তীব্র বেদনা বৃদ্ধ যেন অবচেতনে অপরিচিত এক যুবকের মধ্য দিয়ে পূরণ করতে চেয়েছিলেন তাকে 'মোমেন' নামে সম্বোধনের মধ্য দিয়ে। প্রবাদ আছে, 'দুধের স্বাদ ঘোলে মেটে না' তেমনি যেন কথিত পিতা-পুত্রের মধ্যে অদৃশ্য দূরত্ব রয়েই গেল। তাছাড়া ব্যক্তির কাছে তার জন্মভিটা অমৃতসম। অন্ধও ঠিক হাতড়ে হাতড়ে নিজ বসতভিটাকে খুঁজে নেয়। শুধু ভিটা বদল হয় নারীর এবং প্রকৃতার্থে কোন ভিটাই তার নয়, অধীশ্বর পুরুষই থাকে। এই আধিপত্য পুরুষের অস্থি-মজ্জায় গেঁথে আছে। ফলে শত আদর সোহাগেও রাজ্জাক ওরফে মোমেনের মন ভরে না। চর আলেকজান্দ্রার রাজ্জাক তৃষ্ণার্ত চাতকের মতো জলের তৃষ্ণায় কাতর। তার অস্তিত্বের সংকটও এই পিপাসার নেপথ্যেও কারণ–

> দর্জি আর বিবি তাকে ভালোবেসে, কিন্তু সে ভালোবাসা তার অন্তর স্পর্শ করেনি, যদিও স্তব্ধ-স্থবির মন সে-সম্বন্ধে নিস্পৃহভাবে সজ্ঞান। কিন্তু আজ ওপারে বালুর চরে ধুলো উড়তে দেখে হঠাৎ চর আলেকজান্দ্রার কথা মনে হলো, এবং সে আকস্মিকভাবে অনুভব করলো যে, দূরে কোথাও স্নেহমমতার জোয়ার বইছে, কিন্তু এখানে কেবল কালো মাটি, যে-কালো মাটির বুকে বাস করছে এক নকল রাজ্জাক এবং বাস করছে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ হয়ে, আর তার মন আবদ্ধ হয়ে রয়েছে অর্থহীন স্থবিরতায়। (ওয়ালীউল্লাহ্‌, ২০১৩, পৃ. ৩৪২)

প্রেম, যৌনতা ব্যক্তির চিরন্তন এই আকাঙ্ক্ষাকেও লেখক এখানে অস্বীকার করেননি। "খুনী" গল্পে নারী-পুরুষের শাশ্বত এই চাহিদাকে লেখক নির্মোহ দৃষ্টিতে প্রকাশে সচেষ্ট ছিলেন। জরিনার রসিকতা, চোখের ভাষা একজন পুরুষ মানুষ রাজ্জাক ওরফে মোমেনকে সাহস জোগাবে, বিচলিত করবে, কামনায় উদ্দীপ্ত করবে এই সহজাত সত্যও এখানে প্রকাশিত হয়েছে। অসুস্থ বাঘ সুস্থ হলে যেমন খাদ্যের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে; তেমনি পুরুষ-মানুষ রাজ্জাক বৃদ্ধ দর্জির ভিটায় ঠাঁই পেয়ে বসত গেড়েছে। এবার তার নজর পড়ে বাড়ির বিধবা বৌ জরিনার উপর। ঠিক সেই ক্ষণটাতে বৃদ্ধ দর্জির হারানো পুত্রের আবির্ভাব তার জীবনের মোড় আবার

অনিশ্চিত পথে ঘুরিয়ে দিল। সদ্য আবির্ভূত দর্জিপুত্রের রাগান্বিত ঔৎসুক দৃষ্টি রাজ্জাকের মনস্তত্ত্বে তীব্র আঘাত করে। অস্তিত্বের সংকটে দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে নতুন এক উপলব্ধিবোধে দৃঢ় আত্মবিশ্বাসে সে উপস্থাপন করলো আত্মপরিচয়–'আমার নাম আবদুর রাজ্জাক। আলেকজান্দ্রার চরের সোনাডাঙা গেরামের ফজু মিঞাদের বাড়ির ফইন্যারে আমি খুন করছি–গত চৈত মাসে।' (ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১৩, পৃ. ৩৪৫)

যে খুনের শাস্তির ভয়ে সে পলাতক সেই শাস্তি যেন তারই অজান্তে পাওয়া হয়ে গেছে। নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে খুনি রাজ্জাক পরিচয়ই তার স্বীকারোক্তিতে স্পষ্টভাবে সামনে এসে দাঁড়ায়।

নিজস্ব পরিচয় আর অতীত কৃতকর্ম বয়ান করে রাজ্জাক শেকড়চ্যুতির সংকট থেকে যেমন মুক্ত হলো, তেমনি তার অপরাধের ভার থেকেও যেন কিছুটা নিষ্কৃতি পেলো। এখানে পুরুষ চরিত্রের আরও একটি দিক সম্পর্কেও লেখকের ভাবনা সুস্পষ্ট তা হলো, অস্তিত্বের প্রশ্নে পুরুষ পরাজয় মেনে নিতে পারে না। রাজ্জাকের কাছে মিথ্যা পরিচয়ের ফাঁস গলায় নিয়ে বাঁচার চেয়ে, সত্য পরিচয়ে যুদ্ধ করাই সঠিক বিবেচিত হয়।

"মতিউদ্দিনের প্রেম" গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র ক্ষীণদেহী মতিনউদ্দিন যে সমাজের দৃষ্টিতে স্বল্পভাষী, নম্রলাজুক সেই একই ব্যক্তি ঘরে সিংহের গর্জন, বাঘের ভয় এই চেহারা নিয়ে বিরাজমান–

> বাইরের মতিনউদ্দিন এবং ঘরের মতিনউদ্দিনের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। ...ঘরে তার স্ত্রী ছাড়া দ্বিতীয় কোন লোক না থাকলেও মনে হয় যেন তার হুকুম তালিম করাবার জন্য মোসাহেব গোমস্তা বাবুর্চি-খানসামা পেয়াদা-হুঁকাবরদারের অন্ত নেই। তখন তার ত্রিশ ইঞ্চি বুক থেকে অহরহ বাঘের মতো আওয়াজ বের হয়। ...মতিনউদ্দিনের খড়মেও কম আওয়াজ হয় না। বরাবর দেখে-শুনে শক্ত মজবুত খড়ম কেনে সে। বস্তুত, তার ঘরের জাঁদরেল সত্ত্বাটির একাধারে তার গলা অন্যধারে খড়ম। (ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১৩, পৃ. ৪৩০)

মতিনউদ্দিনের চরিত্রটি প্রকৃতপক্ষে তৎকালীন পুরুষতান্ত্রিক মুসলমান সমাজের প্রতিনিধিত্ব করে। কারণ সেকালের চিত্র ছিল অন্দরমহলে সেবিকা ও ভোগের সামগ্রী হিসাবে

নারীদের যাপিত জীবন। সংসার এবং নারীর ওপর পুরুষের ছিল একচ্ছত্র আধিপত্য। কৌশলে, শাসনে-শোষণে নানাভাবে তারা নারীদের নিয়ন্ত্রণে রাখত। মতিনউদ্দিনের আত্মকথনে প্রমাণ মেলে–

> পারিবারিক শাসন-সংযমের খাতিরে কঠোর ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তায় সে বিশ্বাসী বলে তার মনোভাবের বাহ্যিক কোন পরিচয় সে দেয় না। কিন্তু খালেদার প্রতি তার স্নেহ-মমতা-দায়িত্ববোধের অন্ত নেই। (ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১৩, পৃ. ৪৩৩)

অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক তার কাছে অনেকটা প্রভু-ভৃত্যর সম্পর্কের মতো। নারীর সনাতন স্বভাব যে, এ প্রভুত্বতেই অভ্যস্ত, মতিনউদ্দিনের স্ত্রীর আচরণ তার প্রমাণ দেয়। হঠাৎ অদৃশ্য এক নারীর প্রতি প্রেম-ভাবালুতায় মতিনউদ্দিন সাময়িকভাবে আত্ম-সম্মোহিত প্রেমিকপুরুষ হিসেবে সংসারে বিচরণ করলেও শেষপর্যন্ত সে পুরানো চেহারায় প্রত্যাবর্তন করে। কারণ এটিই তার মজ্জাগত প্রকৃত পরিচয়–'দুর্ধর্ষ গলায় হুংকার দিয়ে বলে, মশারিতে হাজারো মশা। কী করে মানুষ চোখ বোজে?' (ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১৩, পৃ. ৪৩৬)

আসলে এভাবেই চোখ বন্ধ করে সমকালীন মুসলমান শাসিত সমাজ ধর্মান্ধ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে শুধু অন্ধকারে ডুবে ছিল না, নারীর ওপর তাদের সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব আরোপ করে রসাতলের চূড়ান্ত পৌঁছায়।

"পরাজয়" গল্পটি পুরুষের পৌরুষ এবং তার মানব পরিচয়ের চরম পরাজয় নির্মম নগ্নতায় বিপর্যস্ত। পুরুষ নামক মানুষের ভেতর গুপ্ত পাশবিক অবয়বের চূড়ান্ত নগ্ন রূপ লেখক কঠিন নির্মোহতা নিয়ে গল্পটিতে উন্মোচন করেছেন–

> নোতুন প্রশ্ন নিয়ে মজনু তাকালো কালুর পানে। কালু গলায় কেমন আওয়াজ করে উঠলো।
>
> –কী হইলো তোমাগো?
>
> কোন উত্তর নেই, এবং এ নিরুত্তর নীরবতার মধ্যে কুলসুমের চোখে হঠাৎ বন্যার মতো এলো জাগতিক চাঞ্চল্য, তারপর ভয়ে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠলো তার দৃষ্টি।

> —তোমরা এমন কইরা চাও ক্যান? না না মোর ভয় করে
>
> কিন্তু কুলসুমের চোখে তখনো উদ্‌ভ্রান্তি, অদ্ভুত আশঙ্কা।...মজনু নেবে গেলো নিচে, কালুও উঠে পড়লো। দু'জনার মুখই কাঠের মতো নিস্পন্দ। (ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১৩, পৃ. ৩২৯)

পুরুষের যৌন বিকৃতির চরম বীভৎসতা, অমানবিকতার অসহনীয় দৃশ্যায়ন এই কথোপকথনের নেপথ্যে গুপ্ত। যে চালার নিচে স্বীয় ভিটেমাটিতে ছমিরের মৃতদেহ শায়িত সেই দেহ শীতল হবার আগেই একই চালার নিচে সদ্য বিধবা কুলসুম স্বামীর বন্ধুরূপী পাষণ্ডদের দ্বারা ধর্ষিতা হয়। লম্পট পুরুষদের পাশবিকতা, বিধবা নারীর স্বামীর মৃত্যু-শোক, মৃত্যু-ভীতি যেন পায়ে পিষে মথিত করে ধরিত্রীতে মিশিয়ে দেয়। পাপিষ্ঠ পুরুষের নৃশংস যৌনাচারের অসহ্য মর্মস্পর্শী কাহিনি হাসান আজিজুল হকের উপন্যাস *সাবিত্রী উপাখ্যান*। সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত উপন্যাসটির শুরুতে একজন পুরুষ হিসেবে তিনি 'সাবিত্রী দেবী'র কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র *চাঁদের অমাবস্যা* উপন্যাসেও কাদেরের হাতে মাঝির স্ত্রী খুন হয়। যদিও তা অসতর্কতার কারণে ঘটে কিন্তু এখানেও নৃশংসতাই প্রকাশিত হয়। হাসান আজিজুল হকের "ঘরগেরস্থি" গল্পের রামশরণ মৃত কন্যার লাশ পাশে রেখে স্ত্রী ভানুমতীর সঙ্গে যৌন সঙ্গমে লিপ্ত হতে মরিয়া হয়ে ওঠে—

> কি একটা ঘোরে ভানুমতীর দিকে সে এগিয়ে গেলে ভানুমতীর চোখ অন্ধকারের মধ্যে জ্বলে। তারার আলোতে রামশরণ সেই চোখে মারাত্মক আক্রোশ এবং অসহনীয় দুঃখ দেখেও জোর করতে থাকে। তখন লাথি ছোড়ে ভানুমতী— সে রামশরণকে ফেলে দেয় ছিটকে, মুখে শুধু বলে, লজ্জা করে না তোমার? (হাসান আজিজুল, ২০১৫, পৃপৃ. ১৪৭-১৪৮)

লাগামহীন যৌন বিকারগ্রস্ততার নানা কুৎসিত রূপ বিচিত্র নগ্ন চেহারা নিয়ে ব্যাধির মত উপন্যাসের বিচিত্র পুরুষ চরিত্রের মাধ্যমে প্রকটিত। আর পুরুষের এই নির্মম নির্লজ্জ যৌন বিকারগ্রস্ত চেহারার মুখোশ উন্মোচনে যেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ছিলেন। "পরাজয়" গল্পটিতে বিধবা কুলসুমকে ধর্ষণের পূর্বে এদের মনস্তত্ত্বের নগ্ন চেহারা লেখক অত্যন্ত নির্মোহভাবে উপস্থাপন করেছেন। এই দুই পুরুষ পথে-ঘাটে নারীদেহ শিকারে মত্ত। এই

বিকারগ্রস্ত পুরুষদ্বয়ের কাছে নারী 'সোনামুখ', 'জলকন্যা', 'রাজকইন্যা' কিন্তু মানুষ নয়, শুধু ভোগের বস্তু—'তার যেন নেশা পেয়েছে, ছোট ঘোলাটে চোখে ঘোর লেগেছে। ...বারে বারে কুলসুমের পানে তাকাতে তাকাতে একবার জিহ্বা দিয়ে ঠোঁটটা চেটে নিলো।' (ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১৩, পৃ. ৩২৮)

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র "মৃত্যু-যাত্রা" গল্পের মহাবুভুক্ষার নিষ্ঠুরতার নির্লিপ্ত বয়ান অতিক্রম করে *পরাজয়* গল্পে লেখকের উপলব্ধি—'দুঃখী ও গরীব বলে তাদের কাছে মৃত্যু এত অস্বাভাবিক, মর্মান্তিক ও দুঃখজনক নয়; ...বরঞ্চ সেটা যেন তাদের কাছে মুক্তি, অর্থশূন্য একটানা নিষ্ফল শ্রমের আসান।' (ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১৩, পৃ. ৩২৫)

এই বাস্তবতা উক্ত গল্পের তিনটি চরিত্র কুলসুমা কালু মজনুর ক্ষেত্রে যতটুকু যথার্থ তার চেয়ে অনেক বেশি "মৃত্যু-যাত্রা" গল্পের বাস্তবতার প্রেক্ষাপট বিবেচনায় প্রযোজ্য। কারণ কথিত লম্পট কালু ও মজনু বন্ধুর লাশ ঘরে রেখে বন্ধু-পত্নীকে ধর্ষণ করে। এই পরিচয় ব্যক্তি পুরুষের নির্মম বিবেকহীন পাশবিক চেহারাকে শতভাগ নগ্ন করে। কিন্তু "মৃত্যু-যাত্রা" গল্পে 'হা' করা বিষম ক্ষুধার অগ্নিকুণ্ডলীতে দগ্ধ বৃদ্ধার মৃত্যু তাদের মধ্যে তেমন ভাবান্তর না ঘটালেও তারা মানবিক বিবেক শূন্য হয় না—

> 'এমন সময় একটা কান্নার রোল উঠলো মেয়েদের মধ্যে। বুড়ি মরলো অবশেষে। মেয়েরা কাঁদলো, আর পুরুষরা কিছু খাঁটি কিছু ভান-করা দুঃখে নীরব হয়ে রইলো।' (ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১৩, পৃ. ৩৩২)

উক্ত উদ্ধৃতি থেকে আরও একটা বিষয় উঠে আসে, তা হলো নারী-পুরুষের অনুভূতি প্রকাশের ব্যবধান। নারী চিৎকার করতে পারে কিন্তু সমাজ আরোপিত আত্মাভিমানের মিথ্যা সান্ত্বনায় পুরুষ তা পারে না। আবার আধিপত্য বিস্তারের জন্য নিজের প্রাধান্য প্রমাণ এবং টিকিয়ে রাখার জন্য সংসারে পুরুষের আওয়াজ নারীর চেয়ে বেশি। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে শাসন-শোষণের কৌশলের পরিপ্রেক্ষিতে নারী-পুরুষের মনের গড়ন ও জীবন বাস্তবতা এভাবেই বিন্যস্ত, নিয়ন্ত্রিতও বটে। এ গল্পের আরেকটি দৃশ্যায়নেও পুরুষের ক্ষমতায়ন ও বিবেকহীনতার পরিচয় মেলে, বৃদ্ধার লাশের সামনেই দুই পুরুষের ইগো ও ক্ষমতার লড়াই শুরু হয়ে যায়—'লাফিয়ে

উঠে ঝাঁপিয়ে পড়লো তিনুর ওপর, এবং তাইতে লেগে গেলো ভয়ঙ্কর হাতাহাতি।' (ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১৩, পৃ. ৩৩৬)

জাহাজিদের একাকিত্ব, প্রেমহীনতা, যৌনতাবিহীন জীবন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র "জাহাজী" ও "রক্ত" গল্পের মূল উপজীব্য। সমুদ্রে নিঃশেষিত জীবনের অভিজ্ঞতা আর গভীর উপলব্ধিতে ভারাক্রান্ত বৃদ্ধ করিম সারেঙ্গ আর কর্মচারী যুবক আবদুল যেন একই জীবনবাস্তবতার মুখোমুখি। শুধু বয়সের তারতম্যে তাদের আকাঙ্ক্ষার পার্থক্য ঘটায়। যেখানে ছাত্তার বৃদ্ধ সারেঙের অন্তরে পিতৃত্বের গোপন সাধ জাগিয়ে তোলে, সেখানে বহুদিন নারী সান্নিধ্যবিহীন আবদুল নারীর আকাঙ্ক্ষায় কামুক হয়ে ওঠে। বন্দরে বন্দরে জাহাজিরা যৌন ক্ষুধা মিটিয়ে ফিরে যায় জাহাজ জীবনে, আবদুলও সেই জাহাজিদের একজন। বলা যায়, যুগে যুগে পুরুষের মূল আকর্ষণ নারী, আলোচ্য বিষয়ও নারী। আবদুল আর আক্কাসের আলাপে সেই সত্য আরও একবার উন্মোচিত হয়–'আচ্ছা গো দোস্ত, তুমি তো গোটা দুনিয়া ঘুরছ। বল দিখিনি কোন দেশের মেয়েছেলে সবচেয়ে খোবসুরত?' (ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১৩, পৃ. ৩৪৯)

আক্কাসের জিজ্ঞাসা আবদুলের অতীত অন্ধকারে আলো ফেলে– 'কামনায় অন্ধ হয়ে সে বন্দরে নেবেছে; তখন রূপ নজরে পড়েনি।' (ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১৩, পৃ. ৩৪৯)

নারী এই শ্রেণির পুরুষদের কাছে 'মেয়েছেলে', 'মেয়েমানুষ' নামক শুধু একটা মাংসপিণ্ড বৈ আর কিছু নয়। নারীর মানুষ অবয়ব গুরুত্বপূর্ণ নয়। পুরুষ চরিত্রের এই স্বরূপও নারীর জীবনবাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে তাৎপর্যবহ। এতে পরিবার ও সমাজে নারীর অবস্থান যে কত ভয়ানকভাবে নিগৃহীত তা স্পষ্ট হয়। আক্কাস দাম্পত্য জীবনের একান্ত গোপন কথা আবদুলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে দ্বিধাবোধ করে না–

> জানো গো দোস্ত এই খাটিয়া আমাকে পেরাইবার করতি হয়। বিবির সঙ্গে ভাব থাকলি তো ভালো, নইলে এটি নিয়ে এসে আমি এখানেই শুই। তা, বিবির মেজাজ আজকাল চালের বাজার হয়ে উঠেছে, ছোঁয়া যায় না গো, একটু থেমে এবার কেমন পিচ্ছিল পুলকে ফিসফিস করে বললে, বিবির মেজাজ আজকে কিন্তুক বড্ড মিঠে। (ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১৩, পৃ. ৩৪৯)

এই ‘পিচ্ছিল অনুভূতি’ শব্দের গুঞ্জন হয়ে দীর্ঘদিন নারীসঙ্গ বিহীন আবদুলকেও গোপনে রোমাঞ্চিত করে তোলে–

> জাহাজ পুরুষ : সাগরে নারী নেই। কিন্তু এখানে সাগর নেই, এখানে নারী রয়েছে। আড়চোখে সে একবার আক্কাসের আবছা বন্ধ ঘরের পানে তাকালো। সে ঘরে অন্ধকারে একটা নারী হয়তো পা ছড়িয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে। (ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১৩, পৃ. ৩৫০)

এই কল্পনা আবদুলের দেহটা ঝাঁঝালো পুলকে উষ্ণ করে তুললো। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের “প্রাগৈতিহাসিক” গল্পের ‘ভিখু’ চরিত্রের নব-রূপায়ণ যেন এই আবদুল, আক্কাস, কালু, মজনু প্রমুখ পুরুষরা। ভিখুর নারীর প্রতি পাশব কামনার সঙ্গে প্রধানত কালু-মজনুর মতো পুরুষদের খুব একটা তফাৎ নেই–

> তাহার মনে হয় পৃথিবীর সমস্ত পুরুষকে হত্যা করিয়া পৃথিবীর যত খাদ্য ও যত নারী আছে একা সব দখল করিতে না পারিলে তাহার তৃপ্তি হইবে না। (মানিক, ২০১৭, পৃ. ২৬৪)

বিকারগ্রস্ত এই পুরুষদের কাছে নারী যৌনক্ষুধা মেটানোর জন্য এক ধরনের সুস্বাদু খাদ্য ব্যতীত আর কিছু নয়। যক্ষ্মা আক্রান্ত আবদুলের মুখ থেকে নির্গত লাল রক্ত যতই উপচে পড়ছে ততই যেন তার মৃত্যুর ভয় নয় বরং যৌন তাড়না বাড়ছে। *রক্ত* গল্পটিতে পুরুষের যৌন বিকৃতির চূড়ান্ত পরিণতি যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

পুরুষশাসিত মুসলিম সামন্ত সমাজে নারীর পর্যুদস্ত জীবন, শুধু পুরুষের দেহ-ক্ষুধা নিবৃত্তিকরণের জন্য নারীর ব্যবহৃত হওয়ায় দুর্দান্ত প্রতীকী রূপ হয়ে রচিত “খণ্ড চাঁদের বক্রতায়” গল্পটি। ইসলাম ধর্মে চারটি বিয়ে করা জায়েজ। মুসলমান সামন্ত প্রভু শেখ জব্বার ধর্মের সেই কর্তব্য সম্পাদনে তৎপর। ইতোমধ্যে তার ঘর আলো করে তিন বিবি রয়েছে। চতুর্থ বিবি বয়স অতি অল্প থাকায় এতোদিন বাবার বাড়িতে থেকেছে বড় হবার অপেক্ষায়। এখন তার বয়স বারো অর্থাৎ এখন সে স্বামী শেখ জব্বারের শয্যাসঙ্গী হবার উপযুক্ত হয়েছে–‘বিয়ে হয়েছে দুবছর

বটে, তবে বিবি বয়সে কচি ছিলো বলে তাকে বাপের বাড়িতেই রাখা হয়েছে।' (ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১৩, পৃ. ৩৫০)। লেখক প্রৌঢ় শেখ জব্বারের চতুর্থ স্ত্রীর আগমনের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে—

> নতুন বিবির বয়স অতি অল্প হয়তো বারো। ছোট মুখ, আর ছোট দেহ। অলঙ্কার আর জামা কাপড়ের তলে দেহ আছে কিনা সন্দেহ। ...ছয়টি ঘোড়া আর ছয়টি মানুষ প্রতিদিন রোদে ঘেমে পানিতে ভিজে যে অর্থ এনেছে, তার অনেকটাই হয়তো, এ-ক্ষুদ্র মেয়েটির দেহে অলঙ্কাররূপে গিয়ে চড়েছে। (ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১৩, পৃ. ৩৫৩)

যৌনাচারকে চরিতার্থ করার জন্য অকাতরে অর্থের অপচয়কেও লেখক এখানে কটাক্ষ করেছেন। আজ এই বারো বছরের শিশু কন্যা, কচি বিবির দেহ ভক্ষণের উদগ্র বাসনায় শেখ জব্বারের আনন্দের সীমা নেই। লেখক এই আনন্দকে চিহ্নিত করেছেন 'আনন্দের আগুন' হিসেবে। মেষশাবকরূপী কচি বিবির হাড়-মাংস-মেদ-মজ্জা ভক্ষণের জন্য প্রৌঢ় শেখ জব্বার মুখিয়ে আছে—

> শেখ জব্বারের চোখ কিসের নেশায় এমন ঢুলছে? কে জানে। তার চোখ হয়তো অন্ধকারে ঘনিয়ে উঠেছে, যে অন্ধকার পৃথিবীর নিষ্ঠুরতম বেদনাকে হেসে উপেক্ষা করা যায়। (ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১৩, পৃ. ৩৫৫)

লেখক এখানে একটি অপ্রাপ্ত বয়সী মেয়ের, প্রৌঢ় স্বামী কর্তৃক বিয়ে নামক নির্মম যৌন নির্যাতনের আগাম ইঙ্গিত করেছেন। তিন সতীনের নির্দয় নির্যাতনে বারো বছরের বিবি যখন অচেতন; তখন শেখ জব্বারের দেহ-মন কামুকতার শীর্ষে ঝুলন্ত—

> আকাশে হয়তো গুচ্ছ গুচ্ছ ফল ঝুলছে, তার প্রত্যেকটি মহব্বতের রসে ভরা, কেন অত আঙুর, কেনই-বা ঝুলছে? ঝুলছে শুধু নারীর দেহে ঝর ঝর করে ঝরে পড়বার জন্যে। জয় হোক নারীর দেহের আর গুচ্ছ গুচ্ছ আঙুর ফলের...। (ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১৩, পৃ. ৩৫৭)

মুসলিম সামন্ত সমাজের চরম যৌন বীভৎসতা গল্পটিতে যেন 'খণ্ড চাঁদের বক্রতা'-র আড়ালে ধারালো ছুরির প্রতীক হয়ে উঠেছে। নারীর মন ও দেহকে কামুক পুরুষ নামক যে ছুরি বিকৃত লালসা যৌনতার নামে নিষ্ঠুরভাবে খণ্ড-বিখণ্ডিত, রক্তাক্ত করে তোলে।

একজন পুরুষের অন্ধকার জগতে ইয়ার দোস্তদের নিয়ে কাটানো অতীত এবং পরবর্তীকালে জীবন যখন তাকে একটু একটু করে আলো দান শুরু করলো তখন তার মনোজাগতিক জীবনের ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন *সেই* "পৃথিবী" গল্পটির মূল প্রবণতা। সঙ্গে গল্পকার লোকটির মাধ্যমে চাকরি নামক সোনার হরিণের মাহাত্ম্যও বয়ান করেছেন। সঙ্গে তিনি আরও একটা বাস্তবতা দৃশ্যমান করেছেন, তা হলো অর্থ এবং পরিবেশ ব্যক্তিকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। কেউ ইতিবাচক কেউ বা আবার নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হয়। যখন সাদেকের অর্থ ছিল না তখন সমাজের সামনে নিজেকে তুচ্ছ মনে হয়েছে। কিন্তু হঠাৎ চাকরি প্রাপ্তির পর তার মনোজগতে এক বিশাল পরিবর্তন শুরু হয়–'ভারি মনে হচ্ছে নিজেকে, এবং ভারিত্ব দামের। কে যেন তাকে দাম দিল।' (ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১৩, পৃ. ৩৫৮)

এ মূল্য আসলে যতটা না নিজেকে যোগ্য ভাবার কারণে, তার চেয়ে অনেক বেশি অর্থপ্রাপ্তির জন্য। অর্থ তাকে সমাজে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠার সিঁড়িতে পা রাখার অনুভবে আবেগাপ্লুত করে তোলে। তার লোমশ কুৎসিত চেহারা, কৃষ্ণবর্ণ দেহে অদ্ভুত এক আত্মবিশ্বাস সঞ্চারিত হয়। মাসে মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত হলে, প্রথমেই সাদেকের পুরুষ-দেহ নারীসঙ্গ পেতে কাতর হয়ে ওঠে–

> একবার সে চুরি করতে গিয়েছিলো। দেয়ালে ফুঁটো দিয়ে যে-ঘরে উঁকি মারলো, সেটা ছিলো শোবার ঘর।... সে আলোয় নজরে পড়লো খাটের উপর ঘুমন্ত একটি মেয়ে, ... ঘুমন্ত মেয়েটির মাধুর্য যে তাকে আকৃষ্ট করেছিলো তা নয়; যে-জন্যে সে ফুটো থেকে দৃষ্টি সরাতে পারছিলো না– সেটি হলো মেয়েটির একটি স্তন! (ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১৩, পৃ. ৩৫৮)

সাদেকের এই কামজ মন একসময় ধাবিত হয় একটি সংসারের দিকে–

> স্বামী-স্ত্রী আর দুটি ছেলে। স্বামী-স্ত্রী কথা কইছে অনবরত; কোলের বাচ্চাটা থেকে থেকে আধো আধো কী সব বকছে...। আশা নেই কিন্তু-এ কথা জানে সাদেক, তবু অভ্যাসমতো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখে নিল ক'টা চুড়ি হাতে, আংটি আছে কি না, গলার হার কী রকম–কিন্তু আসলে কী যে দেখছিলো সে কথা সে তখন বোঝেনি–এতদিন পরে এমন অদ্ভুত পরিবেশে সেকথা বুঝতে পারছে যেন অস্পষ্ট

> ছায়ার মতো বুঝতে পারছে যেন, এবং তাতেই থেকে-থেকে তার সারা অন্তর উদ্বেলিত তরঙ্গিত হয়ে উঠছে। (ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১৩, পৃ. ৩৬১)

অর্থাৎ সাদেকও চেতনে-অবচেতনে সংসার খোঁজে। অর্থনৈতিক নিরাপত্তা তার সেই নারী-সংসার-সন্তানের গোপন আসক্তি নতুন করে জাগিয়ে তোলে। "কেরায়া", "জাহাজী", "খুনী", "সেই পৃথিবী" প্রভৃতি গল্পে পুরুষের পিতৃত্বকে ঘিরে সংসার ভাবনা প্রবলভাবে প্রকাশিত। গল্পকার সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সম্পর্কে গবেষক সৈয়দ আবুল মকসুদের মন্তব্য—

> 'ওয়ালীউল্লাহ্‌র সঙ্গে তাঁর পূর্ববর্তী বাঙালি গল্পকারদের ব্যবধান এখানেই, তিনি নিছক কাহিনী শোনানোর জন্য গল্প লেখেননি, কাহিনী তাঁর কাছে উপায় এবং উপলক্ষ্য মাত্র—লক্ষ্য নয়।' (মকসুদ, ২০১৫, পৃ. ১৭৪)

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র লক্ষ্য ছিল পক্ষপাতদুষ্ট এই সমাজে নিরপেক্ষ বোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দাঁড়িয়ে ব্যক্তির অন্তর্দেশে আলো ফেলে একান্ত ব্যক্তিগত, যাপিত, সামাজিক—এই ত্রয়ী জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ ও বাস্তবতা অনুসন্ধান। যেখানে ব্যক্তি কখনো নৈর্ব্যক্তিক, কখনো লিঙ্গভেদে উপস্থিত হয়েছে। তবে যেভাবেই হোক না কেন তাঁর কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল প্রথমত 'মানুষ', প্রধানত পুরুষ-মানুষ, নারী-মানুষ। ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর ছোটগল্পে নারী-পুরুষ নামক উভয় মানুষেরই অন্বেষণ করেছেন। সমাজে চলমান নানা পরিবেশ পরিস্থিতির সাপেক্ষে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র ছোটোগল্পে পুরুষের চেহারা উপস্থাপন, উন্মোচন, বিশ্লেষণ এই আলোচনার মৌল প্রয়াস।

আফসার উদ্দিন, আরশাদ আলীর অন্তর্লোকে আলো ফেলে তিনি যে মানুষটিকে বের করে এনেছেন, সে মানুষটি সমাজের অন্তর্গত হয়েও বহিরাগত। কারণ সামাজিক জীবন নারী-পুরুষের শাশ্বত বন্ধন, বিয়ে ও দাম্পত্য জীবনে এই দুই-পুরুষই কোনো না কোনোভাবে ব্যর্থ। তাছাড়া অন্যান্য গল্পকারদের স্বাভাবিক যে প্রবণতা কাহিনির বয়ান, আঙ্গিক নির্মাণ প্রভৃতি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য ছিল না। বরং এই ব্যর্থতার মূল কারণ খোঁজ করাই যেন লেখকের উদ্দেশ্য ছিল। মরিয়ম বেগম, হাসিনা বিবির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে আসলে তিনি ব্যক্তিকে ছাপিয়ে পরিবারের দিকে অঙ্গুলি তুলেছেন। পারিবারিক মূল্যবোধ যেমন ব্যক্তিকে নির্মাণ করে; তেমনি সেই ব্যক্তি-ই সমষ্টি হয়ে সমাজকে বিনির্মাণ করে। অর্থাৎ ব্যক্তি ও সমাজ মুদ্রার এপিঠ-

ওপিঠ। পরস্পর পরস্পরকে গড়ে-ভাঙে, সমন্বয় করে। কিন্তু এই দুই-পুরুষ শ্রেণিগত পার্থক্যের কঠিন শেকলকে ভাঙতে গিয়ে নিজেরাই তাতে আবদ্ধ হয়ে পড়েন।

এই জগত-সংসারে নারী-পুরুষ উভয় মানুষের নিজস্ব কিছু সহজাত স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতি আছে, যা তারা জন্মসূত্রেই অধিকারপ্রাপ্ত হয়। এই দাবি তাদের জীবনের কাছে অনিবার্য চাওয়া। নারীর কন্যা-জায়া-জননী-প্রেমিকা-বন্ধু নানা প্রতিকৃতির রূপ; পুরুষও পিতা-স্বামী-পুত্র-প্রেমিক-বন্ধুত্বের মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্কের মেলবন্ধন লালন করে। মানুষ হিসেবে নারী জন্ম দেয় তাই তারা স্রষ্টা ফলে একান্ত অন্তর্গতবোধে তারা অনেক বেশি শক্তিশালী সংবেদনশীল অনুভূতির অধিকারী। জীবন-সংলগ্ন এই অনুভূতি প্রকাশে নারীর আবেগ যতটা উচ্চগামী পুরুষের ততটাই নিম্নগামী। সামাজিক শাসন-অনুশাসন নারীর মতো পুরুষের অনুভূতি প্রকাশেও নানা কাঁটাতারের বেড়া তুলে দিয়েছে। তবুও পুরুষ আবেগকাতর হয়, ব্যথিত হয় কখনো আবার নির্লিপ্তও হয় বটে। "জাহাজী" গল্পের বৃদ্ধ করিম সারেঙ্গের পিতার স্নেহ উদ্বেলিত হয়ে ওঠে ছাত্তারের সংস্পর্শে, অন্যদিকে "খুনি" গল্পের আবেদ দর্জি কোনো এক আবেগঘন মুহূর্তে খুনি রাজ্জাককে সন্তানের অধিকার প্রদান করলেও শেষপর্যন্ত মাঝখানের গভীর দেয়াল কেউ-ই ভাঙতে পারে না। রাজ্জাকের প্রস্থান তাকে বিচলিত করে না। এ ক্ষেত্রে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের মানসভাবনাও দায়ী। নারী যে-কোনো মায়ের সন্তানকে সহজেই নিজের করে নিতে পারে। কিন্তু পুরুষের ঔরসজাত সন্তানের অহংবোধ হয়তো তার পিতৃত্ববোধের অনুভবকে কখনো কখনো নিয়ন্ত্রণও করে। "কেরায়া" গল্পের মুমূর্ষু বুড়ো, নৌকার গলুইতে শোয়া ছেলেটাকে দেখে, তার মৃত ছেলের কথা মনে পড়ে যায় কিন্তু শেষপর্যন্ত কেউ কারো কাছে যায় না। ভীষণ এক নির্লিপ্ততা নিয়ে পরস্পর দূরে থাকে। নেপথ্যের কারণ হয়তো মুমূর্ষু বৃদ্ধের মৃত্যুভীতি একইসঙ্গে জীবনকে আঁকড়ে বাঁচার আকুতি, কিশোরের নির্মম ক্ষুধার যন্ত্রণা।

এভাবে গল্পগুলোতে পুরুষের পিতৃত্ববোধ, পিতার স্নেহে এই যুবক, কিশোরদের জড়াতে চাইলেও ব্যর্থ হয়, কখনো আবার আবেগ বরফ হয়ে অনীহার জন্ম দেয়। কখনো কখনো আত্মার সম্পর্ক রক্তের চেয়ে বড় হলেও এখানে তা মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয় নিষ্ঠুর জীবনবাস্তবতার নিষ্পেষণে। এই অক্টোপাসে ছাত্তার, রাজ্জাক, নৌকার গলুইয়ের সেই কিশোর, সবাই নিষ্পেষিত। সেখানে আবেগানুভূতির চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে জীবনের কাঠিন্য। পিতৃত্ব কিংবা মাতৃত্ববোধ স্থান-কাল-পাত্রের উর্ধ্বে এক অবিমিশ্র আবেগমথিত চিরন্তন অথচ অমূল্য অনুভূতি। যেখানে মৃত্তিকার আদিম সন্তান ঢোঁড়াই আর গহীন সমুদ্রে ভাসমান জীবনে অভ্যস্ত বৃদ্ধ সারেঙের

অনুভূতি একাকার হয়ে মিশে যায়। *ঢোঁড়াইচরিত মানস*-এর ঢোঁড়াই বৃদ্ধ করিম সারেঙের মতো খিরিস্তান ছেলে এন্টনির মধ্যে তার ফেলে আসা অতীতের স্বপ্ন খোঁজে। ঢোঁড়াইয়ের মনের গহীনে একটা পশ্চিমা মেয়ে তার স্বপ্ন বাস্তবতার সম্ভাবনা হয়ে কড়া নেড়ে যায়। গুপ্ত পিতৃত্বের অভূতপূর্ব টান সে খিরিস্তান ছেলেটার প্রতি অনুভব করে–

> সবাই ঘুমোলে, ঘুমন্ত ছেলেটার পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়। অন্ধকারে ছেলেটার মুখের দিকে চেয়ে কার যেন একটা সাদৃশ্যের কথা ভাবতে চেষ্টা করে। নিজে হাওয়া খাওয়ার ছলে একখানা পুরনো খবরের কাগজ দিয়ে ছেলেটার গায়ের থেকে মশা তাড়ায়। আহা, পিঠটা ঘেমে উঠেছে। ...নিদ্রাহীন চোখের সম্মুখে তাৎমাটুলির মধুর স্মৃতির ছবিগুলো জীবন্ত হয়ে উঠেছে...একটা পচ্ছিমা মেয়ের ছবি... পিদিম দিতে এসেছে গোঁসাইথানে। (সতীনাথ, ১৪১৯, পৃ. ২৭১)

এই জীবনের প্রান্তলগ্নে পিতৃত্বের সাধ আকাঙ্ক্ষা সংসার আসক্তির টানাপোড়েনে ‘বৃদ্ধ করিম সারেঙ্গ’ আর ‘ঢোঁড়াই’ সমান্তরাল মনোভূমিতে দণ্ডায়মান। একটা সময় এসে পুরুষ তার উত্তরাধিকার খোঁজে, সংসার খোঁজে, অবলম্বন খোঁজে এই সত্য এখানে প্রতিভাসিত।

“পরাজয়” এই পুরুষশাসিত সমাজের পৌরুষত্বের ক্ষমাহীন পরাজয়, তীব্র বিকারগ্রস্ত নৃশংস যৌনাকাঙ্ক্ষা কালু ও মজনুকে পাশবিক জানোয়ারে পরিণত করে। স্বামীর লাশের সামনে নির্দ্বিধায় তারা মাঝি বৌকে ধর্ষণ করতে বিন্দুমাত্র বিবেক আক্রান্ত হয় না। প্রত্যেক পুরুষ তথা মানুষের ভেতরে যে গুপ্ত পশুর বাস, তার স্পষ্ট চেহারা এখানে লেখক প্রতিফলিত করেছেন। পশুত্ব মাথা চাড়া দিয়ে উঠলে মনুষ্যত্ব পরাজিত হয়। প্রাগৈতিহাসিক গল্পের ভিখু, দুঃসময়ে তাকে আশ্রয় দেয়া বন্ধুর পত্নীকে ধর্ষণে উদ্যত হতে দ্বিধা করে না, রোগাক্রান্ত ভিখারিনী পাঁচীকে পাবার জন্য তার সঙ্গীকে নির্মমভাবে খুন করতে তার মন এক মুহূর্তেও জন্যও বিচলিত হয় না। ভিখুর পাশবিকতা নানা চেহারায় জগদীশ গুপ্ত, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, হাসান আজিজুল হক, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ প্রমুখের গল্প-উপন্যাসে নগ্নভাবে প্রকাশিত। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ এই পাশবিকতার নানা রূপ প্রকাশের মাধ্যমে সমাজের ভয়াবহ অধঃপতনের পর্দা উন্মোচন করে পাঠককে চোখে আঙুল দিয়ে অন্ধকারের দিকে ধাবিত করেন সত্য উদ্ধারের প্রয়াসে। পুরুষ তাদের প্রভুত্ব থেকে কখনো অবসর নেয় না। এই শাসন তাদের স্বভাবজাত। “মতিনউদ্দিনের প্রেম” গল্পের মতিনের হুংকার, পুরুষের মিথ্যা আস্ফালনকে লেখক ব্যঙ্গ করেন।

শাশ্বত মাতৃত্ব আপনপর বোঝে না, তার কাছে সন্তান যারই হোক, নারী মাত্রই মা। বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায়ের "মানুষ" গল্পে নারীর মাতৃত্বের আকুতির ভেতর দিয়ে মানুষের পরিচয় উদ্ভাসিত। যখন সদ্য সন্তানহারা মা, প্রতিবেশীর ঘরে সন্তান জন্মানোর খবর পেয়ে আকুতি নিয়ে বলেন—'ভগবান, বাঁচাইয়া রাখো।' (বলাই চাঁদ, ২০০৫, পৃ. ৬৪)। "স্তন" গল্পে এই চিরন্তন মাকে সামন্ত প্রভু সালাউদ্দিন সাহেব চোখ রাঙানি আর অর্থ দিয়ে কিনতে চায়, এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেই যেন বিরাগভাজন প্রকৃতি নির্মম প্রতিশোধ হয়ে সদ্য মৃত সন্তানের মায়ের দুগ্ধ ভরাট স্তন দুধ শূন্য করে দেয়। প্রকৃতি যেন বলতে চায়, এ অমূল্য সম্পদের উৎপত্তি নিখাদ মমত্ববোধ থেকে, একে অর্থ দিয়ে কেনা যায় না। একমাত্র সম্মান আর ভালোবাসা দিয়ে একে জয় করতে হয়। অর্থগৃধ্নু সালাউদ্দিন সাহেবদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয় মায়ের ভালোবাসা অপার অসীম অমূল্য, অসম্মানে সে ভালোবাসা গুম হয়ে যায়, সদ্য সন্তানজাত মায়ের ভরাট স্তন দুধশূন্য হয়ে যায়।

জীবন বড্ড নির্মম! এই বেঁচে থাকা সুদে-আসলে তার হিসাব যেমন বুঝে নেয় তেমনি মৃত্যুও অপেক্ষায় থাকে জীবনকে পরাস্তকরণে। কিন্তু "মৃত্যু-যাত্রা" গল্পের বৃদ্ধও যেন একরোখা সে যেন জীবন-মৃত্যু কারো কাছে মাথা নিচু করতে রাজি নয়। দুর্ভিক্ষের তাড়নায় স্তব্ধ নিঃশ্বাস মুঠোতে পুরে মৃতদেহ হয়েও ঠাঁয় বসে রইলো এই 'মৃত্যু-যাত্রা'র হিসাব বুঝে নেয়ার জন্য। সেই একই তেজ অনুভূত হয় চর আলেকজান্দ্রা গায়ের খুনের দায়ে পালানো রাজ্জাকের চরম সংকটকালীন পরিস্থিতিতে মেরুদণ্ড সোজা করে স্ব-পরিচয় প্রদানের দৃশ্যে। দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে মানুষ ভেঙে-চুরে গুড়িয়ে যায় নয়ত মরিয়া হয়ে জীবনের সঙ্গে, নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে টিকে থাকতে চায়। এই টিকে থাকার প্রতিযোগিতায় রাজ্জাক শেষ পর্যন্ত জিতে যায়। অন্যের দেওয়া অনুগ্রহের জীবনকে এক নিমিষে ছুঁড়ে ফেলে আবেদ দর্জির বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। বৃদ্ধের মৃতদেহ আর রাজ্জাক প্রতীকী প্রতিবাদ হয়ে এখানে প্রতিভাসিত।

যৌনতা ব্যক্তিমাত্রই আকাঙ্ক্ষিত অনুভব ও অধিকার। পুরুষ নির্গত করে আর নারী ধারণ করে। হয়ত তাই পুরুষের পিছুটান কম এবং বোহেমিয়ান কামুকতা দ্বারা সে অহর্নিশি তাড়িত। ধারণের বেদনা, দায়িত্ব থেকে সে মুক্ত তাই এক ধরনের অনুভূতিশূন্য যান্ত্রিক যৌনবোধও কখনো কখনো তাকে আক্রান্ত করে। তবে কি এ কারণেই পুরুষ বহুগামী? কখনো সঙ্গিনীর প্রতি নির্লিপ্ত, নির্দয়ও বটে! নারীর প্রতি এত লিবিড তাড়নাও কি তবে এর কারণ? "পরাজয়", "খণ্ড চাঁদের বক্রতায়", "রক্ত", "সেই পৃথিবী", "পাগড়ি", "গ্রীষ্মের ছুটি" প্রভৃতি গল্পের পুরুষরা কোনো না

কোনোভাবে যৌনতার প্রশ্নে পাশবিক, নিষ্ঠুর, কামুক। এই প্রবৃত্তির তাড়নায় তারা এতটায় নিমজ্জিত, যেখানে বিবেকবোধ শূন্যের কোঁঠায়। কারণ তাদের নারীর মতো ধারণ করার ক্ষমতা নেই । ফলে নারীর মতো যৌনবোধের গভীরতা স্পর্শ করতে পারে না।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র ছোটগল্পে বিধৃত পুরুষ অবয়ব এই বিশ্বসংসারে নানা কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তাদের ব্যক্ত-অব্যক্ত অনুভূতি, প্রেম-প্রেমহীনতা, দায়িত্ব-দায়িত্বহীনতার বিচিত্রবোধ নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। তাদের অন্তর্গত-বহির্গত নানাবিধ মানসিক-জাগতিক পরিবর্তন যতটা না সমাজের প্রেক্ষাপটে বরং তার চেয়ে অনেক বেশি ব্যক্তির নিজস্ব অবস্থানের ভিত্তিতে গল্পকার এখানে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এর মাধ্যমে ব্যবচ্ছেদ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। পিতা-স্বামী-পুত্র এই সনাতন কাঠামোর বাইরে পুরুষকে দাঁড় করিয়ে তাদের মানুষ সত্তার ভেতর-বাহিরের একান্তই পুরুষ অবয়ব পাঠ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র স্বজাত-সহজাত প্রবণতা। এই অসাধারণ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মন-মনন-সৃষ্টিশীল শিল্পের দ্বারা তিনি তাঁর গল্পের জমিনকে বিন্যস্ত, কর্ষিত, উর্বর এবং ঋদ্ধ করেছেন। এখানেই তিনি স্বতন্ত্র ও সার্থক।

১.আলোচ্য গবেষণার ক্ষেত্রে বর্ণনাত্মক, বিশ্লেষণাত্মক, তুলনামূলক, মানবিকী ধরণ প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়েছে। তথ্যপঞ্জিসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে নির্দেশিত নিয়মাবলি অনুসরণ করা হয়েছে।

২. পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ও পুরুষের ভণ্ডামির মুখোশ-উন্মোচনে প্রথম কলম ধরেন ১৭৯১ সালে, লন্ডনের এপিং অরণ্যের দরিদ্র কৃষক পরিবার থেকে উঠে আসা ৩২ বছর বয়সের তরুণী Mary Wollstonecraft (1759-1797). রচনা করেন নারীর স্বাধিকারের প্রথম 'মুখপত্র' বিপ্লবের বহিস্ফুরণ গ্রন্থ *A vindication of the rights of woman* (1792)। এর ১৫৭ বছর পর আবির্ভাব ঘটে আরেক তেজস্বী নারী Simone de beayvour (1908-1986) রচনা করেন নারী-অধিকারের অসাধারণ গ্রন্থ The second sex (1949) এই দুইজন অগ্নিশিখার মাঝখানে আলোকিত আরেক অগ্নিকন্যা বেগম রোকেয়া (১৮৮০-০১৯৭২), যাঁর জন্ম ভারতবর্ষের মুসলিম ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত পরিবারে, তিনি রচনা করেন *Sultana's dream* (1908) অবরুদ্ধ পুরুষ আর মুক্ত নারী তাঁর রচনার বিষয়। দুঃসাহসিক এই রচনা দিয়ে তিনি নারী জাগরণের ঘোষণা দেন। অত্যাশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে পৃথিবীর তিন মেরু থেকে উঠে আসা এই তিন নারীর চিন্তার যোগসূত্র ছিল এক ও অদ্বিতীয় আর তা হচ্ছে 'নারী পুরাতনী' 'নারী চিরন্তনী' প্রভৃতি ধারণাকে তাঁরা সমূলে উড়িয়ে দেন। Simone de Beauvoir বিবৃতি দিয়েছেন 'One is not born, but rather becomes a woman.. (Simone de Beauvior, The second sex, 1997, 295)

৩. সঙ্গম থেকে নারী-পুরুষের সমস্ত সম্পর্ককে একটি তাত্ত্বিক কাঠামোতে ব্যাখ্যা করেছেন Kate Millett (1934-2017) তাঁর *Sexual Politics* (1969) গ্রন্থে দেখিয়েছেন–

Patriarchy, reformed or unreformed, is Patriarchy still, its worst abuses purged or foresworn, it might actually be more stable and secure than before.

৪. সিমোন দ্য বেভোয়ার তাঁর *দ্বিতীয় লিঙ্গ* গ্রন্থে অস্তিত্ববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে নারী-পুরুষের অবস্থান ব্যাখ্যা করে আশাবাদী হয়েছিলেন যে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হল নারী অধিকারের আলোকবর্তিকা। পরে হতাশ হয়ে দেখেছেন যে–

Representation of the world, like the world itself, it is work of men, the describe it from their own point of view, which the confuse with absolute truth (Simone de beauvior, *The second sex, 1997, 295*)

সহায়কপঞ্জি

ওয়ালীউল্লাহ্, সৈয়দ। (২০১৩)। *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র রচনাবলি* [সম্পা. সৈয়দ আকরম হোসেন], চারুলিপি, ঢাকা।

জীবনানন্দ দাশ। (১৯৯৪)। *জীবনানন্দ দাশের কাব্যসমগ্র* [সম্পা. করিম, বজলুল], জীবন প্রকাশন, ঢাকা।

বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায়। (২০০৫)। *বনফুলের শ্রেষ্ঠগল্প*। নন্দন, ঢাকা।

মকসুদ, আবুল। (২০১৪)। *স্মৃতিতে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্*। প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। (২০১৭)। *মানিক রচনাবলি* ২য় খণ্ড। ঐতিহ্য, ঢাকা।

মোস্তফা, আহমাদ কামাল [সম্পা.] (২০১৭)। *হাসান আজিজুল হক শ্রেষ্ঠ গল্প*। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা।

শাহেদ আলী। (২০১১)। *জিবরাইলের ডানা*, গতিধারা, ঢাকা।

সতীনাথ ভাদুড়ী। (বা. ১৪১১)। *সতীনাথের রচনাবলী ৩য় খণ্ড* [সম্পা. শঙ্খ ঘোষ নির্মাল্য আচার্য], মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা।

হাসান আজিজুল হক। (২০১৫)। *নির্বাচিত গল্প*। ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা।

George Bernard Shaw. (2013). *MAXIMS FOR REVOLUTIONISTS*. Create Space, US.